ছায়াবৃতা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র ভারতী

প্রথম প্রকাশ
৭ অগ্রহায়ণ ১৮৮১ শকাব্দ
নভেম্বর ১৯৫৯

MAJHIR CHHELE
by
Manik Bandyopadhyay

প্রচ্ছদ
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
অঙ্গসজ্জা
ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

Publisher
PATRA BHARATI

ছায়াবৃতা

দ্রুত গলে যাওয়া চকোলেট গলা দিয়ে নেমে গেলেও জিভে একটা আদুরে স্বাদ রেখে যায়, রোদ মরে যাওয়ার পর এই চরাচরে নেতিয়ে থাকা আলো প্রায় সেইরকম। এই আলোকে যতক্ষণ অন্ধকার পুরোপুরি না গিলে ফেলছে ততক্ষণ সন্ধে বলা যাবে না। রাত তো দূর অস্ত্। অথচ ঘড়ির কাঁটা আটের ঘরে। অহনা দেখল, সেই কাঠবিড়ালিটা এখনও ফুটপাতে খাবার খুঁটে মরছে।

দোতলার ছোট্ট ব্যালকনিতে দুটো চেয়ার, দুটো টুল, একটা টেবিল। টেবিলের এক প্রান্তে বেশ বড় গণেশের মূর্তি। গণেশের শুঁড় বাঁদিকে বাঁকানো। সচরাচর গণেশের শুঁড় ডানদিকে বাঁকানো থাকে। বছর খানেক আগে ইউনিয়ন টার্ন পাইকের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একটা বাড়ির সামনে গ্যারেজে সেল নোটিস দেখে দাঁড়িয়েছিল অহনা। সাধারণত কেউ বাড়ি ছেড়ে অন্য শহরে চলে যাওয়ার আগে যা নিয়ে যাবে না, তা বিক্রি করে চলে যায়। বাড়িটিতে গুজরাতি পরিবার থাকত। জামাকাপড় থেকে জুতো, খাট, আলমারির সঙ্গে এই গণেশটিও ছিল বিক্রির জন্যে। ফুট আড়াই-এর পাথরের গণেশের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছিল অহনা। না, ব্যতিক্রমী শুঁড়ের জন্যে নয়, তার মনে হয়েছিল গণেশ হাসছেন। যেহেতু গণেশের মাথা হাতির এবং হাতি একটি প্রাণী তাই এখন পর্যন্ত কোনও প্রাণীকে সে হাসতে দ্যাখেনি। পাশের বাড়ির রবার্টের একটা স্পিৎ আছে। সাদা স্পিৎটা খুব আদুরে। রবার্ট বলে, কুকুরটাকে কাতুকুতু দিলে নাকি খুব মজা পেয়ে হাসে। রবার্ট একাশি পেরিয়েছে। ওই বয়সে চোখে ছানি পড়াই স্বাভাবিক তাই প্রিয় কুকুরকে হাসতে দ্যাখে।

কিন্তু গণেশের এই মূর্তিটার মুখে হাসি হাসি ভাব আছে। যদিও শুঁড়ে ওর মুখ প্রায় ঢাকা, তবু অহনার মনে হয়েছিল তার দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তিটা হাসছে। দরাদরি করে দেড়শো টাকায় কিনে নিয়ে বাড়িতে এসেছিল সে। বেশ ভারী বলে গাড়ি নিয়ে গিয়ে পেছনের সিটে বসিয়ে আনতে হয়েছিল। কিন্তু

ড্রইং কাম লিভিং রুমে কিছুদিন রাখার পর মনে হয়েছিল ওর আলোবাতাস দরকার। তাই ব্যালকনিতে এনে রেখেছে। চব্বিশ ঘণ্টা এই টেবিলের ওপর বসে গণেশ দিন-রাতের আলো-আঁধার দেখে যায়।

গণেশকে বাড়িতে আনার পরে ঢাকায় ফোন করেছিল অহনা। সাড়ে আটটায় ফোন করলে মা ফোন ধরবেই। কারণ সন্ধেবেলায় বাবা সাধারণত বাড়ি ফেরে না। গণেশ কেনার কথা বলেছিল সে মাকে।

মা বলেছিল, 'সে কী রে! এ তো অদ্ভুত কথা। গণেশের শুঁড় তো ডানদিকে থাকে, হুট করে কিনতে গেলি কেন?'

'দেখে মজা লাগল, তাই। কীরকম হাসি হাসি মুখ।'

'ইয়ার্কি মারতে নেই। রোজ একটা করে ধূপ দিস।'

'কেন? এটা একটা শো-পিস। তোমার কাছে ভগবান হতে পারে।'

'যা ইচ্ছে তাই কর। আমি তো দেখতে যাচ্ছি না।' মা ফোন ছেড়ে দিয়েছিল। অহনা জানত, মা ওই সন্ধেটা মনে মনে উলটো-পালটা ভাববে। কিন্তু বাবাকে কিছু বলবে না।

প্রতিদিন সকালে স্নান করে মা ঠাকুরঘরে ঢোকে। অন্তত গোটা সাতেক ঠাকুরের ছবি এবং মূর্তি আছে সেখানে। ফুল দেয়, ধূপ জ্বালায়। এক মিনিট চোখ বন্ধ করে থাকে। তার পর দরজা টেনে বেরিয়ে আসে। ব্যাস, হয়ে গেল মায়ের পূজাপর্ব।

একবার বেশ মজা হয়েছিল। অহনা তখন স্কুলে পড়ে। বোধহয় সিক্স বা সেভেনে। মা গিয়েছিল যশোরে, মামার বাড়িতে। একদিনের জন্যে গিয়ে কোনও কারণে আটকে গিয়েছিল। তিনদিনের দিন সকালে বাবা তাকে বলেছিল 'কী করা যায় বল তো!'

পড়ার টেবিলে ছিল অহনা। অবাক হয়ে তাকিয়েছিল বাবার দিকে।

'তোর মায়ের ঠাকুর-দেবতারা তো তিনদিন না খেয়ে রয়েছেন। একদিন উপবাস করা যায় কিন্তু তা বলে তিনদিন!' বাবা চিন্তিত।

অহনা হেসে বলেছিল, 'কী করে ওদের খাওয়াতে হয় আমি জানি না। মা তো আমাকে ওই ঘরে ঢুকতেই দেয় না।'

'আমি দেখেছি তোর মা কী করে ওদের খাওয়ায়। নাঃ, আমরা খাচ্ছি আর ওঁরা অনশনে থাকবেন—এটা ঠিক নয়।'

বাবা সেই সকালে স্নান সেরে ঠাকুরঘরে ঢুকে ধূপ জ্বালিয়ে ছবিগুলোর

সামনে ধোঁয়া দিয়ে ধূপদানিতে আটকে দিয়ে হেসেছিল, 'ব্যাস, এদের পেট ভর্তি হয়ে গেল।'

বিয়ের আগে মা হিন্দু ছিল, বিয়ের পরেও বাবা সেটা মেনে নিয়েছিল।

ফিরে আসার পর মা ব্যাপারটা জানার পর একটুও রাগেনি।

অহনা গণেশের মূর্তিটার দিকে তাকাল। এখানকার রাস্তায় ধুলো নেই, মূর্তির শরীর বেশ চকচকে আছে। কেউ একজন বলেছিল এই বাঁদিকে শুঁড়ওয়ালা গণেশ নাকি খুব কম পাওয়া যায়। যার কাছে থাকে, তার ভাগ্য ফিরে যায়। লোকে কত বাজে কথায় বিশ্বাস করে! যে-গুজরাতি পরিবারে ইনি ছিলেন তাঁদের তো সব বিক্রি করে এখান থেকে চলে যেতে হয়েছে। আর এবাড়িতে নিয়ে আসার পরে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি অহনার জীবনে।

একটা গাড়ির আওয়াজ কানে এল। প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে সেটা। অহনা দেখল ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমে খাবার খুঁজছে কাঠবিড়ালিটা। শব্দটা ওর কানে যেতেই তিড়িং করে লাফিয়ে ফুটপাতে উঠে এল সে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। আর তার পেছন পেছন ছুটে গেল পুলিশের গাড়ি। এক সেকেন্ড দেরি করলেই মারা যেত কাঠবিড়ালিটা। কিন্তু এত বড় ফাঁড়া কাটিয়েও ও একটুও নার্ভাস হয়নি। আবার ফুটপাতে খাবার খুঁজছে। অহনা ব্যালকনি থেকে ভেতরে চলে এসে কিচেন থেকে কৌটোটা তুলে নিয়ে আবার ব্যালকনিতে ফিরে গিয়ে ডাকল, 'আয় আয়।'

যাকে ডাকল তার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই অথচ পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে উঁকি মারল অন্য দুটো কাঠবিড়ালি। এরা বয়সে এবং আকৃতিতে ছোট। দোতলা থেকে বাদাম ছড়িয়ে দিল অহনা। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে চলে এসে সেগুলো গিলতে লাগল ওরা। ফুটপাতে থাকা কাঠবিড়ালিটা একবার মুখ ঘুরিয়ে দৃশ্যটা দেখল কিন্তু বাদামের জন্যে না এসে চটপট পাশের গাছে উঠে গেল। খারাপ লাগছিল অহনার। যার জন্যে বাদাম ছড়াল সে যে উদাসীন হয়ে থাকবে, বুঝতে পারেনি।

খারাপ লাগা। আমাদের খারাপ লাগার তো শেষ নেই। বেঁচে থাকার সময়ে কত কত কারণে যে খারাপ লাগা তৈরি হয়, তার শেষ বোধহয় নেই। হিসেব করতে গেলে দিশেহারা হয়ে যেতে হবে। কিন্তু একটা ব্যাপারে অহনা নিশ্চিত, কেউ উদাসীন হয়ে থাকলে তার এখনও বেশি খারাপ লাগে।

এখনও আলো চারপাশে। কিন্তু তার জ্যোতি কমছে। এই সময় গাড়িটা

ধীরে ধীরে এসে থামল পাশের বাড়ির সামনে। গাড়ির দরজা খুলে শিস দিল রবার্ট। অহনা সেটা না দেখার ভান করল। এবার কয়েক পা এগিয়ে এসে রবার্ট চেঁচিয়ে বলল, 'এনি থিং রং?'

অহনা তাও তাকাল না। রবার্ট তার ব্যালকনির নীচে এসে দাঁড়াল, 'তোমাকে একটা জরুরি কথা বলা দরকার। এখন কি বলতে পারি?'

এবার না তাকিয়ে পারল না অহনা।

রবার্ট হাসল, 'কথাটা হল, মাত্র কুড়ি সেকেন্ড আগে আমি আমার শততম প্রেমে পড়ে গেলাম। ব্যাপারটা শুনে তোমার কেমন লাগছে?'

এবার না হেসে পারল না অহনা।

রবার্ট বলল, 'দয়া করে কথা বোলো না। আমি আমার শ্রবণযন্ত্রটি বাড়িতে ফেলে গেছি। অতএব তুমি কিছু বললেও আমি জানতে পারব না। শুধু একটা অনুরোধ, দয়া করে মুখ গম্ভীর করে থেকো না। ঈশ্বর তোমাকে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে পাঠাবেন না। অতএব উপভোগ করো। আমার ডিনারের সময় হয়ে গেছে। বেঁচে থাকলে কাল সকালে দেখা হবে। গুড নাইট।'

বারমুডার ওপর টি-শার্ট পরা একাশি বছরের যুবক রবার্ট চলে গেল পাশের বাড়ির দিকে।

এই পাড়াটা শুধু সুন্দরই নয়, পাড়ায় মানুষগুলোও কোনও অশান্তি চায় না। বেশির ভাগই জু-পরিবার। বাইরের লোক বলতে গুজরাতিরা ছিল আর অহনা। এই বাড়িটা সে কিনেছিল সাড়ে চার লক্ষ টাকায়। সঞ্চয় ছিল চল্লিশ হাজারের মতো। পরিচিতরা এত বড় ঝুঁকি নিতে নিষেধ করেছিল। শুধু বাবা ছাড়া। দেশ থেকে বাবা বলেছিল, 'এই বয়সে যদি চ্যালেঞ্জ না নিতে পার তাহলে কবে নেবে!' কথাটা বুকের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। চল্লিশ হাজার টাকা জমা দিয়ে মাসিক কিস্তিতে বাড়ি কিনেছিল সে। একতলা এবং তিনতলা ভাড়া দিয়ে সেই টাকায় বাড়ির মাসিক কিস্তি শোধ করে যাচ্ছে। আর বছর দুয়েক গেলে বাড়িটা তার হয়ে যাবে। ঢাকা শহরের একটি অতি সাধারণ মেয়ে কখনও ভেবেছিল, নিউইয়র্ক শহরে তিনতলা বাড়ির মালিক হবে!

মানুষটাকে দেখতে পেল অহনা। ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে কুইন্স বুলেভার্ডের দিক থেকে। চকিতে উঠে দাঁড়াল অহনা। বসার ঘর পেরিয়ে দ্বিতীয় শোওয়ার ঘরের দরজায় টোকা মারল সে। কোনও শব্দ নেই। এবার

একটু জোরে শব্দ করল অহনা। ভেতর থেকে বন্ধ করা হয়েছে দরজা। এই ব্যাপারটায় প্রবল আপত্তি তার। কিন্তু কিছুতেই কথা শুনবে না মেয়ে।

শেষে দরজা খুললেন তিনি। তাকে দেখে চক্ষু চড়কগাছ অহনার। একটা ষোলো বছরের মেয়ে কী করে শরীর না ঢেকে ঘুমাতে পারে? চোখ সরিয়ে নিয়ে অহনা বলল, 'তোমার টিচার এসে গেছে। দয়া করে ভদ্র মেয়ের মতো পোশাক পরে নাও, আমি নীচে যাচ্ছি দরজা খুলতে।'

'মাই গড! আজকে তো আসার কথা ছিল না!' নাকি গলায় বলে উঠল মেয়ে। অহনার মনে হল ঠাস করে ওর গালে একটা চড় মারে। যে-দেশে কেউ নিয়মের বাইরে পা ফেলে না, সেই দেশে একজন টিচার পাগল না হলে দু'দিনের বেশি তিনদিন পড়াতে আসে! এতে যার খুশি হওয়ার কথা, সে নাকি কাঁদছে। বেরিয়ে যাওয়ার আগে অহনা বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই চাও না আমি ওঁকে ফিরে যেতে বলি!'

একতলার তিনটে ঘরে দুটো ভাড়াটে। বাঁদিকের একলা ঘরে থাকে জনসন। অদ্ভুত মানুষ। ও বাড়িতে থাকলেও বোঝা যায় না আছে। আজ অবধি ওকে কথা বলতে শোনেনি অহনা। জনসনের ঘরের দরজা বন্ধ। উলটো দিকের দু'ঘরের ফ্ল্যাটে থাকে দুই বোন। পঞ্চাশের আশেপাশে বয়স। দিনরাত ঝগড়া হয় ওঁদের মধ্যে। মাঝে মাঝেই ওপর থেকে ফোন করে সতর্ক করে অহনা। দুই বোন এখনও বাড়ি ফেরেনি।

দরজা খুলল সে। ছিমছাম চেহারার লোকটি বলল, 'গুড ইভনিং। ভাল আছেন তো?'

'হ্যাঁ। আসুন।'

'আজ সন্ধেবেলার কাজটা বাতিল হয়ে গেলে ভাবলাম ওকে ফিজিক্সটা আর একটু ঝালিয়ে দিয়ে যাই। আশা করি ও বাড়িতে আছে।'

'হ্যাঁ। ঘুমাচ্ছিল। ডেকে দিয়েছি।'

দরজা বন্ধ করে ভদ্রলোককে নিয়ে ওপরে উঠে এল অহনা। মেয়ে এর মধ্যে তৈরি হতে পেরেছে কিনা বুঝতে না পেরে বলল, 'বসুন। চা বা কফি...!'

'অনেক ধন্যবাদ। আমি চা খেয়েই বেরিয়েছি।'

স্বস্তি পেল অহনা। এখন তার কিচেনে ঢুকতে একটুও ইচ্ছে করছে না। সে উলটোদিকের সোফায় বসে জিজ্ঞাসা করল, 'ও ঠিকঠাক পড়ছে তো?'

'নিশ্চয়ই। যে-কোনও অ্যাভারেজ স্টুডেন্টদের চেয়ে ও অনেক ওপরে।

খুব চটপট ধরে নিতে পারে। আপনার এই মেয়ে দারুণ ভাল রেজাল্ট করবে।'

'কিন্তু আমার তো মনে হয় ও খুব অলস।'

'আপনার ধারণাটা সঠিক নয়। নিজেদের ভাল কীসে হবে ও খুব ভাল করে বুঝতে পারে। ও কি উঠেছে?'

অহনা গলা তুলে ডাকল, 'তৃণা?'

সঙ্গে সঙ্গে জিনস আর শার্ট পরে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তৃণা, 'গুড ইভনিং স্যার।'

'গুড ইভনিং! আজকে আমরা একটু ফিজিক্সটা নিয়ে বসব।'

তৃণা তার টিচারকে নিয়ে চলে গেল পড়ার টেবিলে।

জ্যাকসন হাইটের বাংলা বই-এর দোকানের মালিক সিরাজুল ভাই খুব মিশুকে মানুষ। সব সময় হেসে কথা বলেন। তাকে মেয়ের জন্যে একজন ভাল টিচার জোগাড় করে দিতে বলেছিল অহনা। শুনে সিরাজুল বলেছিলেন, 'তোমার কপাল ভাল।'

'আমার কপাল? সেটা যে কীরকম, তা তো আপনার অজানা নয়।'

'আরে! তুমি সব সময় সব কথাকে এত সিরিয়াসলি নাও কেন বল তো? আমি বলতে চাইছি তুমি মেয়ের জন্যে একজন ভাল টিচার খুঁজছ আর আজই স্বপ্নেন্দু বলে গেল ও একটা টিউশনি করতে চায়। বিজ্ঞান পড়াবে।'

'স্বপ্নেন্দু কে?'

'কলকাতার ছেলে। স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে এসেছিল। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। এখন কীসব গবেষণা করছে। পড়াশুনা ছাড়া আর কোনও চিন্তা ওর মাথায় নেই। এরকম টিচার কপাল ভাল হলেই পাওয়া যায়।'

'বয়স কত?' অহনা জিজ্ঞাসা করল।

'তোমার আর তোমার মেয়ের ঠিক মাঝখানে।' হাসলেন সিরাজুল ভাই, 'অহনা, তুমি আর কতদিন বাঙালিপনা নিয়ে থাকবে?' সিরাজুল হেসেছিলেন।

প্রতিবাদ করেছিল অহনা, 'এ কী বলছেন চাচা? আমেরিকায় এসেছি বলে আমি নিজের ভাষা, ঐতিহ্যের কথা ভুলে যাব? তাহলে তো বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ বৃথা হয়ে যাবে।'

'দূর পাগলি! আমি বলেছি বাঙালিপনার কথা, বাঙালিত্ব নয়। আমরা বাঙালিরা কতগুলো পুরনো অভ্যেস, যার কোনও বাস্তবমূল্য নেই, তাই

অজান্তে আঁকড়ে থাকি। এই যেমন, ছেলেটির বয়স কত তুমি জানতে চাইছ। কেন চাইছ? কারণ তোমার মেয়ের বয়স পনেরো-ষোলো। কাছাকাছি বয়স যদি হয় তাহলে সে মেয়ের প্রেমে পড়তে পারে কিংবা শারীরিক সংস্পর্শে আসতে পারে। বাঙালিপনা তোমাকে সতর্ক করল। যদি শোন ছেলেটির বয়স ষাট-সত্তর তাহলে সেই মানসিকতা নিশ্চিত হয়ে তোমাকে খুশি করবে। তাই তো?' সিরাজুল একটু থামলেন। অহনা কথা খুঁজছিল।

সিরাজুল বললেন, 'এই মুহূর্তে তুমি ভুলে যাচ্ছ, মেয়ে বড় হচ্ছে, আমেরিকায় পড়ছে, ছেলেদের সঙ্গে প্রেম-শরীর নিয়ে ওর আগ্রহ থাকলে ইতিমধ্যেই হয়ে যেতে পারে। ওর বয়সে প্রচুর মেয়ে অ্যাবর্ট করছে অথবা মা হয়ে যাচ্ছে। এই দেশটা বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়া নয় যে, চব্বিশ ঘণ্টা তুমি মেয়েকে পাহারায় রাখতে পারবে। তা সত্ত্বেও টিচার রাখার সময় তোমার মাথায় প্রশ্ন এল ওর বয়স কত? এটাই বাঙালিপনা।'

হাতজোড় করল অহনা, 'মাপ করবেন, অন্যায় হয়েছে। আসলে আমি ভেবেছিলাম অল্পবয়সিদের অভিজ্ঞতা কম থাকে, একটু বয়স হলে—!'

'ভুল, অল্পবয়সিরা পড়াশুনার মধ্যে থাকে। পদ্ধতিটা ওরাই ভাল জানে। স্বপ্নেন্দু ছাত্র হিসেবে ব্রিলিয়ান্ট। চিন্তা কোরো না।'

'কত দিতে হবে?'

'সেটা ওর সঙ্গে কথা বলে নাও।'

'সিরাজুল চাচা, আপনি ঠিক করে দিন।'

'না অহনা, তোমার মেয়ে পড়বে, স্বপ্নেন্দু পড়াবে। আমি যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি, টাকাপয়সার মধ্যে আমি নেই।' সিরাজুল সেলফোন বের করে নাম্বার টিপলেন। তারপর মাথা নাড়লেন, একটু জোরে বললেন, 'স্বপ্নেন্দু। আমি যোগাযোগের সিরাজুল ভাই বলছি। টিউশুনির ব্যাপারে আপনি এই নাম্বারে ফোন করতে পারেন। সিক্স ও ফোর, ট্রিপল টু, তিনটে শূন্য চার। যাকে পড়াতে হবে তার মায়ের নাম অহনা, অহনা আমিন। ধন্যবাদ।'

অহনা হেসে ফেলল।

সিরাজুল বলল, 'ভয়েস মেলে খবরটা রাখলাম। হাসছ কেন?'

'ট্রিপল টু-র পরে তিনটে শূন্য শুনে।' অহনা এগিয়ে গেল বই-এর র‍্যাকের দিকে।

এই একটি জায়গায় এলে মন আনন্দে ভরে যায়। এখন মনেই হয় না যে সে হাজার হাজার মাইল দূরে স্বেচ্ছানির্বাসনে বাস করছে। এখন তার চারপাশে বাংলার গন্ধ, চোখ বন্ধ করলেই তালসুপারির সারি, ফসলের মাঠ, মায়ের চাল ধোয়া হাতের সুবাস। বাংলা অক্ষরগুলো যেন আদুরে হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে। এদিকে হুমায়ূন আহমেদ, সৈয়দ শামসুল হক, শামসুর রাহমান, জাফর ইকবাল তো ওদিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, সুচিত্রা ভট্টাচার্য! দুই বাংলা তাদের সীমান্ত মুছে ফেলে দু'হাত এক করে বসে আছে সিরাজুল চাচার বাংলা বইয়ের দোকানে। প্রথমদিকে দোকানে এসে অহনা বলেছিল, 'আপনার দোকানের নামটি সুন্দর। সঠিক।'

'আমার কোনও কৃতিত্ব নেই ভাই।' সিরাজুল মাথা নেড়েছিলেন।

'তার মানে? নামটা কি অন্য কেউ দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁকে আমার হয়ে ধন্যবাদ দেবেন। যোগাযোগ-এর বিকল্প হয় না।'

'দেওয়া যাবে না ভাই। কারণ তিনি একচল্লিশ সালে দেহ রেখেছেন।'

'মানে?'

'আর কী বলব? আমি যা ভাবি বা করি সব তো তাঁর কাছ থেকে নিয়ে করতে হয়। ওঁকে ছাড়া বাঙালির মুক্তি নেই।' বলে দেওয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের ছবিটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন সিরাজুল।

রবীন্দ্রনাথ মানেই পাকা দাড়ি, আলখাল্লা পরা বয়স্ক একটি মানুষের ছবি ভাসে চোখের সামনে। মনে করতে চাইলে তরুণ রবীন্দ্রনাথ, যার গালে সদ্য গজানো দাড়ি, মাথায় টুপি, মনে করা যায়। কিন্তু সিরাজুলের দোকান যোগাযোগের দেওয়ালে যে-রবীন্দ্রনাথের ছবি টাঙানো তা আগে দ্যাখেনি অহনা। পরিষ্কার দাড়ি কামানো, চুল স্বাভাবিক ছাঁটা, মধ্য তিরিশের এক ঋজু যুবক, যাঁর চোখ ধ্রুবতারার সন্ধান দিচ্ছে। দেখা মাত্র ধ্বক করে উঠল বুক। কীরকম তিরতিরিয়ে উঠল শরীর, চোখ নামিয়ে নিল অহনা। ওই মুখের দিকে আবার তাকাতে জড়তা এল তার।

সিরাজুল বললেন, 'ওঁর আর একটা ছবি আমি দেখেছি। ইন্ডিয়ার মংপুতে। তখন বৃদ্ধ বয়স। চুল একেবারে ছোট করে ছাঁটা। দেখলে প্রথমে বিশ্বাসই হবে না উনি রবীন্দ্রনাথ। আর এই ছবি দেখে আমি ভাবি আল্লা যখন কাউকে দেন তখন তাঁর সঞ্চয় উজাড় করে দিয়ে থাকেন।'

এবার ছবিটার দিকে তাকাল অহনা। সঙ্গে সঙ্গে তার দুটো পা পাথর হয়ে গেল। শরীরে শিরশিরে অনুভূতি কিলবিল করছে।

রাত্রে বাড়ি ফিরে তীব্র অস্বস্তি। ঘুম আসছিল না। চোখ বন্ধ করলে তো বটেই। চোখ খুললেই তিনি। রাত তখন এগারোটা। পাশের ঘরে মেয়ে পড়ছে। আলো জ্বেলে আয়নার সামনে দাঁড়াল সে। তার জীবনে পুরুষ এসেছে অযাচিত ভাবে। কিন্তু কখনওই এইরকম অনুভূতি হয়নি। সিরাজুলের দেওয়া কার্ডটা বের করে ফোনের বোতাম টিপল সে। একবারও খেয়াল এল না এখন ফোন করা উচিত কিনা। সিরাজুলের গলা কানে এল, 'হ্যালো।'

'আমি অহনা।'

'অহনা? ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমি আজ আপনার দোকানে গিয়েছিলাম।'

'ওহো, হ্যাঁ। কী ব্যাপার?'

'আমার একটা ইচ্ছে পূর্ণ করবেন?'

'যদি সাধ্যে কুলায়—।'

'আপনার দোকানের দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার একটা কপি আমাকে দেবেন? প্লিজ।'

স্বপ্নেন্দু এসেছিল ফোন করে। বয়স বছর ছাব্বিশেক হলেও ব্যক্তিত্ব ঢের বেশি। কথা বলেই বোঝা গেল এ অনেক সিরিয়াস ছেলে। মেয়ের তীব্র আপত্তি ছিল প্রথমে। দু'দিন পড়ার পর এসে বলেছিল, 'মাম, হি ইজ সুপার্ব।'

টাকাপয়সার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল অহনা, 'আমি মেয়েকে নিয়ে থাকি। আপনি যদি রাজি হন তাহলে ওর পড়াশুনার বড় দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে। আমার মেয়ে ফাঁকিবাজ, অলস! তবে ওর স্কুলের টিচাররা বলেন ইচ্ছে করলেই ভাল রেজাল্ট করতে পারবে। ওর মনে ওই ইচ্ছেটাকে তৈরি করার ভার আপনার ওপর। এখন বলুন, আপনার সম্মানদক্ষিণা কত দিতে হবে?'

এক চিলতে হাসি স্বপ্নেন্দুর ঠোঁটে এসেই মিলিয়ে গিয়েছিল, 'আপনার পক্ষে যা দেওয়া সম্ভব, তাই দেবেন।'

'না। পরিষ্কার কথা বলুন।'

'এক সপ্তাহ ওকে পড়াই, তারপর বলব।'

দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়াতে এসে মেয়ের ঘরে যাওয়ার আগে স্বপ্নেন্দু তার

সামনে দাঁড়াল, 'আমি সপ্তাহে দু' দিন আসব। ঠিক কোনদিন তা আগে বলা সম্ভব নয়। ফোনে আগাম জানিয়ে দেব। আমার জন্যে মাসে আড়াইশো টাকা রাখবেন। আশাকরি আপনার অসুবিধে হবে না।'

স্বপ্নেন্দু কম কথা বলে। ওর হাঁটাচলা আর পাঁচটা যুবকের মতো নয়। অহনার অনুমান ছেলেটা তার চেয়ে বছর সাতেকের ছোট। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলার সময় সে লক্ষ করেছে, ছেলেটা যা বলে তাই মেনে নিতে হচ্ছে। কারণ অবান্তর কথা স্বপ্নেন্দু বলে না। আর এটাই তার কাছে বিস্ময়ের। তৃণার মতো মেয়ে কী করে স্বপ্নেন্দুর রাশভারী ব্যক্তিত্বকে হজম করছে তা অহনা বুঝতে পারে না। তৃণা তার মেয়ে। পৃথিবীতে এই মুহূর্তে সে ছাড়া তৃণার কোনও আশ্রয় নেই। এসব ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক তার ধার দিয়ে যায় না মেয়ে। যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে তৃণার সঙ্গে বাস করা খুব মুশকিল। একটা ষোলো বছরের মেয়ে যে এতটা স্বার্থপর, উদাসীন এবং বদমেজাজি হতে পারে তা মেয়েকে দেখার আগে কখনও বোঝেনি অহনা। অথচ মেয়েটা তো তার ছায়ায় থেকে একটু একটু করে বড় হল। সেই নয়-দশ বছর থেকে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। বকাঝকা, মারধোর করেও ওকে বদলাতে পারা যখন গেল না তখন হাল ছেড়ে দিয়েছে অহনা। একটি মানুষের শরীরে শুধু মায়ের রক্তই কাজ করে না, মায়ের স্নেহ, রুচি তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, ওই শরীরে বাবার রক্ত সমানভাবে কাজ করে, কখনও বেশি পরিমাণেই।

অথচ যে ওর সংস্পর্শে আসবে, সেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। কী ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে, কী বুদ্ধি, কী চমৎকার ব্যবহার। ওর স্কুলের টিচাররা তো বটেই, পাশের বাড়ির রবার্টের স্ত্রীও সেদিন বলল, 'অহনা, তুমি খুব লাকি। তৃণার মতো মেয়ে হয় না। ওরকম সুন্দরী মেয়ে অথচ কোনও ছেলেকে বাড়িতে ডেকে আনছে না এটা ভাবা যায়! তোমাকে বলছি, ববকে বোলো না, আমার ছোট নাতনিটা, মাত্র চোদ্দো বছর বয়স, গত মাসে অ্যাবর্ট করাতে হয়েছে। তোমার মেয়ে এত ভাল।'

মা শুনলে বলত, ঘর জ্বালানি, পর ভোলানি। কথাটা সে তৃণাকে একদিন বলেছিল। শুনে ভ্রূ কুঁচকেছিল তৃণা, 'মানে কী? তুমি কি বেঙ্গলিতে কথা বলছ! নিশ্চয়ই না।'

রাত আটটার পরে লিটন এল। এসেই বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে, খাওয়া।'

'কী খাবি?'

'ভাত।'

এদেশের বাঙালিদের বাড়িতে বোধ হয় চব্বিশ ঘণ্টা ভাতের ব্যবস্থা থাকে। রবিবার সারা সপ্তাহের জন্যে ভাত রেঁধে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রতিদিন একটু একটু গরম করে নিয়ে খাওয়া। অহনার এটা একদম পছন্দ নয়। টাটকা ভাত না খেলে ওর সুখ হয় না। বলল, 'পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।'

'তাহলে একটা হুইস্কি খাই ততক্ষণ।'

'আমার বাড়িতে হুইস্কি থাকে না তা তুই জানিস।'

'তোর কাছে কে চাইছে, গ্লাস আর বরফ দে।' বলে উঠে কিচেনে চলে গেল লিটন, 'আপনা হাত জগন্নাথ। শালা, দেশে থাকতে এক গ্লাস জল নিজে নিয়ে খেতাম না আর এখানে আমিই আমার চাকর।'

গ্লাসে বরফ ঢেলে টেবিলে রাখল লিটন। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট বোতল বের করে ছিপি খুলে নাকের তলায় ঠেকিয়ে বলল, 'আঃ। জব্বর গন্ধ!'

অহনা কিচেনে ঢুকে মাইক্রো ওভেনে ভাত চড়িয়ে দিল। সেটা করতে করতে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'সঙ্গে কিছু লাগবে?'

'না। দিবি তো বাদাম। ওতে ক্যালরি বাড়বে।'

ভাত চাপিয়ে দিয়ে অহনা লিটনের সামনে এসে বসল। লিটন জিজ্ঞাসা করল, 'জ্ঞান দিবি না?'

অহনা জবাব দিল না।

'তোকে একটা ভাল খবর দিচ্ছি।' লিটন গ্লাসে চুমুক দিল, 'কে মার্ট মোটা টাকায় গারমেন্টের অর্ডার দিয়েছে।'

'কত?'

'পাঁচ লাখ ডলারের।'

'ভ্যাট?'

'হ্যাঁরে, একসঙ্গে নয়, ছয় মাসে ডেলেভারি দিতে হবে। স্পেসিমেন অ্যাপ্রুভ করেছে। আমি ঢাকার সঙ্গে কথা বলেছি। চারটে ফ্যাক্টরির সঙ্গে চুক্তি করতে হবে। এখন হয় তোকে নয় আমাকে ঢাকায় যেতে হবে!' লিটন বলল।

পাগল!' মুখ ফেরাল অহনা।

'কোনও মানে হয় না। তোর মতো মেয়ে যদি চিরকাল অতীত আঁকড়ে

থাকে তো অন্যরা কী করবে! বেশ, আমিই যাব। সামনের সপ্তাহটা দয়া করে অফিসে বোসো।'

'ঠিক আছে। কিন্তু এগারোটার আগে যেতে পারব না।'

'কেন?'

'তুই তো জানিস, তৃণাকে স্কুলে পৌঁছাতে হয়।'

'এখনও? ওর তো ষোলো হয়ে গেছে।'

'চুপ কর। এমনিতেই সাপের পাঁচ পা দেখেছে তার ওপর যদি একা যাওয়া-আসা করতে দিই তাহলে আর দেখতে হবে না।'

'তাহলে তো ছুটির সময়েও আনতে যাবি?'

'না। রবার্টকে বলব। মাসে একশো টাকা যাবে।' অহনা উঠল, 'আর ঢালবি না। ভাত দিচ্ছি।'

লিটন চটজলদি দ্বিতীয়বার হুইস্কি গ্লাসে ঢালল, 'তৃণা কি পড়ছে?'

'হ্যাঁ। ওর টিচার এসেছে।' ভাত নামাতে নামাতে বলল অহনা।

চোখ বন্ধ করে মদ খাচ্ছিল লিটন। ভাতের প্লেট সামনে রেখে বিরক্ত গলায় অহনা বলল, 'আবার নিয়েছিস? পুলিশ ধরলে গাড়ি চালানো বন্ধ হয়ে যাবে।'

'কাকে ধরবে? আমাকে? পেটে হুইস্কি থাকলে স্টিয়ারিং-এ বসে আমি এত নর্মাল হয়ে যাই যে মামারা টেরই পায় না। তুই খাবি না?'

'তৃণার সঙ্গে খাব। তুই শুরু কর।'

হাত ধোওয়ার বালাই নেই, লিটন দ্রুত হাত চালাল। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না, দীর্ঘসময় সে না খেয়ে আছে।

'খাসনি কেন এতক্ষণ?'

'খেয়াল ছিল না।' খেতে খেতে লিটন বলল।

'মীনার খবর কী?'

'জানি না।'

'জানি না মানে?'

'পরশু ফোন করেছিল। আমি তখন অফিসে। বলল, আমি একটু বেড়াতে যাচ্ছি, দু'দিন পরে ফিরব। ব্যাস। লাইন কেটে দিয়েছিল। তার পর থেকে মোবাইল অফ করে রেখেছে। অতএব জানি না বলাটাই সংগত।' খাওয়া থামাচ্ছিল না লিটন। খেতে খেতে বলল, 'এই আলু ভর্তাটা খুব মজার।'

'আশ্চর্য! তোর বউ দু'দিনের জন্যে বেড়াতে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কার

সঙ্গে যাচ্ছে, তা জানার কৌতূহল হচ্ছে না?' রেগে গেল অহনা।

এবার খাওয়া থামাল লিটন, 'দিস ইজ নট ফার্স্ট টাইম। গেছে আবার ফিরেও এসেছে। তুই জানিস না?'

'তাই বলে—!'

'কোনও বলে-টলে না!' গলা তুলল লিটন, 'কৌতূহল? কী কৌতূহল দেখাব? তুমি কার সঙ্গে গিয়েছ! কোথায় গিয়েছ? সেখানে যে ঘরে আছ, সেই ঘরটা কীরকম? যে-পুরুষের সঙ্গে গিয়েছ, সে আমার চেয়ে কতটা আকর্ষণীয়, এই সব?'

'আস্তে কথা বল।'

'সরি।'

'লিটন বার বার এরকম হচ্ছে, তুই মেনে নিচ্ছিস কী করে?'

'তুই বুঝবি না। জীবনে একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়, যখন মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও পথ খোলা থাকে না।'

'কেন? আলাদা হয়ে যা।'

হাসল লিটন। খাওয়া শেষ করে প্লেট গ্লাস নিয়ে কিচেনে চলে গিয়ে ওগুলো সিঙ্কে রেখে হাত-মুখ ধুয়ে নিল।

'প্লেট ধুতে হবে না।' চেয়ারে বসে জানাল অহনা।

'তুই আগে আমাকে দু'দু'বার বলেছিলি আলাদা হওয়ার কথা। আমি চাই মীনা আমাকে কথাটা বলুক। ও খুব চেষ্টা করছে। কিন্তু যাদের সঙ্গে ও সম্পর্ক তৈরি করছে, তাদের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। ফলে একটার পর একটা ভুল করে যাচ্ছে। তাই আলাদা হওয়ার কথা বলতে পারছে না।'

'তুই নিজে বলছিস না কেন? কী করে মেনে নিচ্ছিস?'

'ওই তো সমস্যা।'

'সমস্যাটা কী আমি বুঝতে পারছি না। তোর বউ একের পর এক ছেলের সঙ্গে রাত কাটাতে বাইরে যাচ্ছে আর তুই সেটা উপভোগ করছিস?'

লিটন তাকাল অহনার দিকে। একটু হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'চলি। ভাত খাওয়ার পরে ঘুম পাচ্ছে।'

লিটন চলে গেল।

লিটন তার ব্যবসার পার্টনার। খাতায়-কলমে তাই, লাভ হলেই ভাল টাকা পায় অহনা, কিন্তু পুরোটাই দেখাশোনা করে লিটন। আমেরিকার বিভিন্ন বড়

বড় শপিং সেন্টারের চাহিদা অনুযায়ী দেশ থেকে জামাকাপড় আমদানি করে ওরা। শুরুর সময়ে কিছু টাকা অহনা দিতে পেরেছিল লিটনকে। সেই সুবাদে এখনও সে পার্টনার। নিয়মিত সে টাকা পায় না ঠিকই, কিন্তু যখন যা পায় তা সারা বছরের জন্যে যথেষ্ট বেশি।

লিটনকে অহনা চেনে ছেলেবেলা থেকে। একই পাড়ায় থাকত ওরা। রোগা, ছোটখাটো চেহারার ছেলেটার সম্পর্কে কৌতূহল ছিল না পাড়ার কোনও মেয়ের। অহনারও নয়। প্রায় সতেরো-আঠারো বছর পরে আবার যোগাযোগ হল নিউইয়র্কে। পারতপক্ষে ট্যাক্সিতে ওঠে না অহনা। ম্যানহাটনে গিয়েছিল কাজে। হঠাৎ বুকে চিনচিন ব্যথা শুরু হল। যেহেতু ব্যথাটা ডানদিকে তাই প্রথমে পাত্তা দেয়নি। কিন্তু সেটা যখন বাড়তে লাগল তখন বাড়িতে ফিরতে চাইল সে। টিউব বা বাসে চেপে আসতে গেলে হাঁটতে হবে, সময় লাগবে বলে বাধ্য হয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বলেছিল, 'কুইন্স, ইউনিয়ন টার্ন পাইকের কবরখানার পাশে।' বলে ট্যাক্সির পিছনের সিটে চোখ বন্ধ করে বসেছিল সে।

'শরীর খারাপ?' ড্রাইভার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেও অবাক হয়নি অহনা। নিউইয়র্কে বাঙালি ট্যাক্সি ড্রাইভার অনেক। সে মাথা নেড়ে নিচু গলায় বলেছিল, 'হ্যাঁ।' গাড়ি চালাতে চালাতে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কোথায় যাব? বাড়ি না হাসপাতালে?'

'আপনাকে আমি হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলিনি।'

'ও।'

সারাটা পথ আর কথা হয়নি। ইউনিয়ন টার্ন পাইকের কাছে এসে ড্রাইভার বলেছিল, 'বাড়িতে অ্যান্টাসিড আছে?'

'না।'

'রাখা উচিত।' গাড়িটা একটা দোকানের সামনে দাঁড় করিয়ে এক পাতা অ্যান্টাসিড কিনে নিয়ে এসে লোকটা এগিয়ে ধরল, 'এখনই দুটো মুখে পুরে চুষতে থাকুন। তাতে যদি না কমে তাহলে হাসপাতালে যেতে হবে।'

তখন শরীরের যা অবস্থা, তাতে ওষুধ মুখে না দিয়ে পারেনি অহনা।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ভাড়া আর ওষুধের দাম কত হয়েছে?'

'বেশি না। এক মুঠো আনন্দ।' ড্রাইভার আয়নায় তাকে দেখল।

রেগে গেল অহনা, 'আশ্চর্য! আপনি আমার সঙ্গে ফাজলামি করছেন? আপনার আপার সঙ্গে করতে পারেন?'

'আরও বেশি পারতাম কিন্তু আমার নিজের কোনও আপা নেই। আর আপনি তো আমার আপা নন। আপনি অহনা।' ড্রাইভার শব্দ করে হাসল।

'আপনি আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?' অবাক হয়ে গেল অহনা।

এবার ঘুরে বসল ড্রাইভার, 'তোর সঙ্গে এককালে তুই-তোকারি করতাম। আমি লিটন। চিনতে পারছিস না? অবশ্য আমি নিজেই নিজেকে চিনতে পারি না আজকাল। সেই যে রোগা, খাটো ছেলে যাকে তোরা পাত্তা দিতিস না।'

'লি-ট-ন?' চেঁচিয়ে উঠেছিল অহনা, 'লিটন তুই?'

'ইয়েস আপা।'

'মারব থাপ্পড়! তুই আমার সমান, আপা বলছিস?'

'এইমাত্র বললি আমি আপার সঙ্গে ওইভাবে কথা বলি কিনা?'

'আমি ভাবতে পারছি না। উঃ, কী পালটে গিয়েছিস তুই। একেবারে ব্যাটাছেলের মতন। বাপস।' মাথা নেড়েছিল অহনা।'

'শরীরটা এখন কেমন?'

'একটু ভাল।'

'হাসপাতালে যেতে হবে না তো?'

'নাঃ।'

'এই নে। আমার কার্ড। ফোন করিস।'

'আমার বাসায় চল। ওইটে আমার বাসা।'

'টাইম নেই। রোজগার করতে হবে। পরে আসব।'

ট্যাক্সি থেকে নেমে অহনা বলেছিল, 'ভাড়াটা নে—!'

'ভাড়া তো পেয়ে গেছি। এই যে এত বছর পরে তোর সঙ্গে দেখা হল এর চেয়ে বেশি আর কী পাওয়ার থাকতে পারে! চলি।' ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল লিটন।

ছেলেবেলায় যাকে ধর্তব্যের মধ্যেই রাখত না, সেই লিটনের সঙ্গে এমন একটা অনাবিল বন্ধুত্ব তৈরি হতে পারবে, ভাবতেও পারেনি অহনা। নিউইয়র্কে আসতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল লিটনকে। আসার পর রেস্টুরেন্টে চাকরি করেছে, ম্যানহাটনে একটা টুপির দোকানে সেলসম্যান হয়েছে, তারপর পরীক্ষা দিয়ে ট্যাক্সি চালাবার লাইসেন্স পেয়েছে। সপ্তাহে

একদিন এবাড়িতে আসত লিটন। কথাবার্তা বলার সময় মনে হত তাদের সম্পর্ক বহু বছর। ঠিক ভাইবোন, দুই বন্ধু অথবা বাবা-মা কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকা নয়, সব মিলিয়ে মিশিয়ে এমন একটা ঘোঁট পাকানো সম্পর্ক যা কারও পক্ষে আর আলাদা করা সম্ভব নয়। সেই সময় মীনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল লিটন। মাস ছয়েক আগে ওদের বিয়ে হয়েছিল।

আলাপের প্রথম দিন, একটা রেস্টুরেন্টে বসে মীনা বলেছিল, 'শুনলাম তোমরা নাকি ন্যাংটো বয়সের বন্ধু?'

ন্যাংটো শব্দটা কানে খট করে লেগেছিল অহনার। মুখ শক্ত হয়েছিল তার। বলেছিল, 'আমরা এক পাড়াতেই থাকতাম।'

'অ। প্রেমট্রেম ছিল না?'

চমকে তাকিয়েছিল অহনা, 'কী বলছ? তখন আমাদের বয়স প্রেম করার মতো ছিল না। তা ছাড়া লিটন সম্পর্কে ওসব চিন্তা আমার মাথায় আসেনি।'

'এখন?'

এবার লিটনের দিকে তাকিয়েছিল অহনা। লিটন গম্ভীর। মীনা বলেছিল, 'কিছু মনে কোরো না, শুনেছি তুমি একলা থাক। এই বয়সে পুরুষমানুষকে একলা পেয়েও কোনও মেয়ে সতীসাবিত্রী হয়ে থাকবে, তা ভাবতেও পারি না।'

খুব খারাপ লেগেছিল মীনাকে। কিন্তু কেউ যদি উপযাচক হয়ে ফোন করে, হুটহাট বাড়িতে চলে আসে, এবং বিশেষ করে সে যদি লিটনের স্ত্রী হয়, তাহলে তাকে এড়িয়ে থাকা যায় না। কিছুদিন মেশার পর অহনা বুঝতে পারল মেয়েটির সব কিছু ভাল, শুধু যৌনসম্পর্ক নিয়ে প্রচণ্ড দুর্বলতা রয়েছে।

একা পেয়ে সে সরাসরি প্রশ্ন করেছিল, 'তোমার সমস্যা কী বলত?'

'তোমার বন্ধু।' মীনা জবাব দিয়েছিল।

'লিটন কী সমস্যা তৈরি করেছে?'

'ওকে বিয়ে করাটা খুব ভুল হয়ে গিয়েছে।' মীনা বলেছিল।

'সে কী!'

'বুঝতে পারিনি।'

'এই কয় মাসে কীভাবে বুঝে গেলে?'

মীনা বলেছিল, 'দ্যাখো আমি যখন সকালে কাজে বের হই, ও ঘুমায়। যখন দুপুরে ফিরি, ও তখন ট্যাক্সি চালাচ্ছে। যখন বাড়ি ফেরে, তখন গভীর রাত।

আমি জেগে থাকতে পারি না। তবু ও এলে দরজা খুলে দিই। এসে হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নিয়ে বিছানায় পড়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। আমার শরীরের চাহিদা কম নয়। কিন্তু আধমরা মানুষটাকে দেখে তখন মনে হয় খুন করি।'

'ছুটি নেই তোমাদের?'

'ওর নেই।'

পরে লিটনকে সে বলেছিল, 'তুই কী রে! মীনাকে সময় দিস না কেন?'

'কোত্থেকে দেব?'

'কেন?'

'ওর জন্যে আমাকে যে টাকা রোজগার করা উচিত তা এত খেটে অর্ধেকও পারছি না। সময় দিতে গেলে তাও কমে যাবে।'

'তাহলে ট্যাক্সি চালানো ছেড়ে অন্য কিছু কর, যাতে রোজগার বেশি হবে আর সময়ও দিতে পারবি।'

'ভাবছি।'

'বিয়ের আগে ভাবা উচিত ছিল।'

'সুযোগ ছিল না।'

'মানে?'

'আলাপের তিন সপ্তাহের মধ্যে ওর সঙ্গে ওসব হয়ে যাওয়ায় বলেছিল ওকে বিয়ে না করলে আত্মহত্যা করবে! আমারও মনে হল এর পরে বিয়ে করা অবশ্যই কর্তব্য। ভাবনাচিন্তার সময় ছিল না। অবশ্য এর জন্যে আক্ষেপ করছি না। অন্য পথ খুঁজছি টাকা রোজগারের। একটা সোর্স পেয়েছি। গারমেন্ট সাপ্লাই-এর। দেশে তো এখন প্রচুর গারমেন্টসের কারখানা। মুশকিল হল ক্যাপিটাল কী করে পাব। মাল আনাতে টাকার দরকার।'

লিটনের কথা কয়েকদিন ধরে ভেবেছিল অহনা। এই বাড়ি কিনে ভাড়া থেকে ইনস্টলমেন্ট শোধ করতে হিমসিম খাচ্ছিল সে। হাসপাতালে ইন্টারপ্রেটারের চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিল বলে রক্ষে। অসুস্থ বাংলাদেশি অথবা পাকিস্তানি মেয়েরা, যারা ইংরেজি জানে না, হাসপাতালে গেলে সমস্যায় পড়েন ডাক্তার-নার্সরা। তখন ইন্টারপ্রেটার তাদের সমস্যার কথা জেনে ডাক্তারকে বুঝিয়ে দেন। কয়েক ঘন্টার চাকরি, কিন্তু তাতে খাওয়া-পরা চলে যাচ্ছিল মা মেয়ের।

শেষ পর্যন্ত বাবাকে ফোন করল সে। আমেরিকায় আসার পরে সে কখনও

বাবার কাছে হাত পাতেনি। নিজে থেকেই বাবা অনেকবার টাকা পাঠাতে চেয়েছে কিন্তু অহনা রাজি হয়নি। সব শুনে বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ছেলেটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য?'

'ব্যবসায় মার খেতে পারে কারণ ওর অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু নিজে থেকে ঠকাবে বলে মনে হয় না। ও অন্যরকম ছেলে।' অহনা ফোনে বলেছিল।

'ম্যারেড? বাচ্চাকাচ্চা আছে?'

'আশ্চর্য, ব্যবসার সঙ্গে বিয়ে বাচ্চার কী সম্পর্ক?' অহনা বিরক্ত হয়েছিল।

'ওর শেকড় আছে কিনা জানতে চাইছি।'

'বিবাহিত, বাচ্চা নেই।'

'তাহলে ওকে বল ছোট আকারে শুরু করতে। আমি তোর নামে দশ হাজার ডলার পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বাবা বলেছিলেন।

'তোমার অসুবিধে হবে না?'

'তোর বিয়ের জন্যে যে টাকা আলাদা রেখেছিলাম তা থেকে দিচ্ছি।'

স্বপ্নেন্দু এসে দাঁড়াল দরজায়, 'আমি যাচ্ছি।'

সোফায় বসেছিল অহনা, উঠে দাঁড়াল, 'কী রকম এগোচ্ছে?'

'চিন্তার কিছু নেই। আমি তো আপনাকে বলেছি ও চাইলে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করতে পারবে। মনে হচ্ছে সেটা ও বুঝেছে।' স্বপ্নেন্দু নিচু গলায় কথাগুলো বলে নীচে নেমে গেল।

দরজা বন্ধ করতে নীচে নামতে হল অহনাকে। এখন এগারোটা বাজে। রাস্তা নির্জন। অদ্ভুত মায়াবী আলোয় পথটা মাখামাখি। চাঁদের আলো নেই, তবু নেতানো নীলচে আলো নেমে এসেছে আকাশ থেকে। দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে স্বপ্নেন্দু মাথা নিচু করে হেঁটে চলে গেল। এইসময় কথা কানে এল। দুটো মানুষ বেশ জোরে কথা বলতে বলতে আসছে। কাছাকাছি এলে চিনতে পারল সে। ওরাও তাকে দেখে চুপ করে গেল।

দরজার সামনে ওকে একজন বলল, 'হাই!'

অহনা বলল, 'হাই!'

ওরা পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। একতলার ভাড়াটে এরা। দুই বোন। পঞ্চাশের কাছে বয়স। বিয়ে হয়নি, হবেও না। একসঙ্গে না থেকে উপায় নেই আবার ঝগড়া না করে কোনও রাত্রে ঘুমায় না।

ওপরে উঠে এল অহনা। তিনতলাটা খালি পড়ে আছে। এখানে একমাস খালি থাকা মানে ইনস্টলমেন্ট দিতে বিপদে পড়া। বাঙালি ভাড়াটে চায় না অহনা। তবু ক'দিন আগে একটি ছেলে ফোন করে এসেছিল। ব্যবসা করে। ফ্ল্যাট দেখে খুব খুশি। ভাড়াতেও আপত্তি নেই। অহনা জিজ্ঞাসা করেছিল, ক'জন থাকবে? ছেলেটি বলেছিল সে মা-বাবাকে নিয়ে থাকবে। সেটা শুনে অহনার মনে হয়েছিল বাঙালি হলেও ভাড়াটে হিসেবে বোধহয় খারাপ হবে না। পরের দিন ছেলেটির দিদি জামাইবাবু এসে ফ্ল্যাট দেখে গেল। সেই সন্ধেয় একটি মেয়ে তার বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে ফ্ল্যাট দেখতে চাইল, বলল, যে-ছেলেটি ভাড়া নিচ্ছে সে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। অতএব যে-ফ্ল্যাটে তাকে ভবিষ্যতে থাকতে হবে সেটা দেখতে চায় সে। অহনা আপত্তি করেছিল। বলেছিল, 'আপনি আপনার হবু স্বামীকে নিয়ে আসুন। তিনি বলেছিলেন বাবা মাকে নিয়ে থাকবেন।'

'অসম্ভব। তাহলে আমি ওকে বিয়ে করব না।' মেয়েটি বলে গিয়েছিল। তারপর ছেলেটিও আর যোগাযোগ করেনি। আজ এক হিস্প্যানিক পুলিশ অফিসার ফোন করেছিলেন। কাল সকালে ফ্ল্যাট দেখতে আসবেন। বাড়িতে একজন পুলিশ অফিসার থাকলে অনেক ব্যাপারে উপকার হতে পারে।

অহনা খাবার গরম করে মেয়েকে ডাকল। তৃণার কোনও সাড়া নেই। নিশ্চয়ই কানে তার গুঁজে গান শুনছে। মেয়ের বেডরুমের সামনে গিয়ে দেখল দরজা ভেজানো, বন্ধ নয়। যাক, কথা কানে ঢুকেছে শেষ পর্যন্ত।

সে দরজা খুলে দেখল টেবিলে আলো জ্বলছে। বই খোলা। ওপাশে কমপিউটার অন করা। তাতে ছবি ভাসছে। আর মেয়ে তার খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। এখন ওকে ঘুম থেকে তুলে খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া মানে পরিশ্রম করা। জামাকাপড় না ছেড়েই ঘুমিয়ে পড়েছে তৃণা।

অহনা টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে কমপিউটার অফ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। পরদায় একটি নারী ভয়ংকর ভঙ্গিতে পুরুষ সঙ্গীকে চুমু খাচ্ছে, দু'জনের শরীরে একটা সুতো পর্যন্ত নেই। চকিতে ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকাল সে। ঘুমালে মানুষের চেহারা শিশুর মতো হয়ে যায়। কিন্তু নেটে গিয়ে এই সাইটে নিশ্চয়ই ঢুকেছিল তৃণা। তারপর ঘুম পেয়ে যেতে বন্ধ করার কথা মাথায় আসেনি। দ্রুত মাউস চালিয়ে ভদ্রস্থ করে কমপিউটার বন্ধ করল অহনা। স্বপ্নেন্দু বলে, চাইলে ও ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করতে পারে। ষোলো

বছরের মেয়ে যদি ঘরের দরজা বন্ধ করে সেক্সসাইটে বিচরণ করে তাহলে তার ভবিষ্যৎ কী হতে পারে তা তো আন্দাজ করতেও হয় না। অহনা ঠিক করল কাল সকালে এ-ব্যাপারে মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে।

সাড়ে আটটায় টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙল অহনার। কাল অনেক রাত অবধি মেয়ের কথা ভেবে ঘুম আসেনি। এখন উঠতে কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু উঠতে হল। রিসিভার তুলে বিরক্তি চেপে রাখল না অহনা, 'হ্যালো?'

'হাই ডার্লিং। আমি আসছি। দরজা খোলো।' রবার্টের গলা।

'ও রবার্ট! প্লিজ!'

'এক কাপ চা খাব।'

'কেন? তোমার বউকে বলো।'

হা হা করে হাসল বুড়োটা, 'তোমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।'

অতএব বাধ্য হয়ে বাথরুমে গেল অহনা। মুখে জল দিয়ে চাবি নিয়ে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে। রবার্ট দাঁড়িয়ে আছে সাদা বারমুডার ওপর সাদা জ্যাকেট পরে। চাবিটা ছুড়ে দিল অহনা। এই বয়সেও ঠিক লুফে নিল বুড়ো। চায়ের জল বসাল অহনা।

ওপরে উঠে রবার্ট বলল, 'গুড মর্নিং। এই সকালটা আমার কাছে একটু আলাদা। সামনের বছর এই সকালটা নাও আসতে পারে।'

'তার মানে?'

'আজ আমার জন্মদিন।' মিটিমিটি হাসছিল রবার্ট।

'ওমা! তাই!' এগিয়ে গিয়ে হাত ধরল অহনা, 'হ্যাপি বার্থ ডে!'

'আজ আমি বিরাশি। একটু চুমু খাও।'

হেসে ফেলল অহনা। তারপর মুখটা এগিয়ে নিয়ে যেতেই রবার্ট চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও।'

অবাক হয়ে মুখ সরিয়ে নিল অহনা। রবার্ট তখন প্রবলবেগে মাথা নেড়ে যাচ্ছে। চোখ বন্ধ। শেষ পর্যন্ত বলল, 'মাই গড! একদম মনে পড়ছে না। পৃথিবীতে এরকম মহিলা একটিই ঈশ্বর তৈরি করেছেন। আমাকে ভোরবেলায় বার্থডে উইশ করার সময় সন্ধেবেলায় যেন বেশি মদ না খাই বলে এমন বকবকানি শুরু করেছিল যে, একদম ভুলে বসে আছি।'

'কী ভুলে গেছ?'

'আরে আমার বউ কোন গালে বার্থ-ডে উইশের চুমু খেয়েছিল? বাঁ গালে না ডান গালে? যে গালে খেয়েছিল সেই গালে আর কেউ, এমনকী তুমিও, চুমু খাও তা আমি চাই না। বছরে একবারই তো চুমু খায়, সারাদিন ওই গালটায় জল পর্যন্ত দিই না। কিন্তু কোন গাল?' চকিতে পকেট থেকে সেলফোন বের করে নাম্বার টিপল রবার্ট। ওপাশের সাড়া পেয়ে হেসে বলল, 'ডার্লিং, তুমি আমার কোন গালে চুমু খেয়েছিলে গো?' প্রশ্ন করা মাত্র রবার্টের চোখ মুখ কুঁচকে গেল। 'ওকে, ওকে' বলে সেলফোন বন্ধ করে দিয়ে শ্বাস ফেলল, 'ওর মা ওকে একটা জিনিস দিয়েছে উজাড় করে। সেটা হল গলা। উঃ। কাককে হার মানায়। তা এখন কী করা যাবে ডার্লিং। আমি তো রিস্ক নিতে পারি না। তুমি আমার কপালে চুমু খাও। পঁয়ত্রিশ বছরের মা বিরাশি বছরের ছেলের কপালে ভালবাসার চুমু এঁকে দিক।' মাথা ওপরে তুলল রবার্ট।

হেসে চুমু খেয়ে অহনা জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি কথা বল তো, তুমি আজ বিরাশি?'

'শিওর।'

'এই বয়সে এত এনার্জি পাও কী করে?'

'আমার বউ যখনই চেঁচায় তখনই আমি আমার গার্লফ্রেন্ডদের কথা ভাবি। সঙ্গে সঙ্গে মন চাঙ্গা হয়ে যায়। বেশ খুশি হই। খুশিতে থাকলে তুমি বুড়ো হবে না।'

'বাব্বা। তোমার ক'টা গার্লফ্রেন্ড আছে?'

'ছিল। ন'টা। আমার কুড়ি থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে। তেষট্টি থেকে তেপ্পান্ন বছর আগের কথা। জানি না তাদের এখন গার্ল বলা যায় কিনা! এত বছরে তারা কেমন আছে দেখিনি তো!' শ্বাস ফেলল রবার্ট।

'তোমার বউ যে গালাগাল দেয়, ঠিকই করে।'

'তা তো বলবেই! কিন্তু ডার্লিং, আমার মতো ভদ্র শান্ত মানুষ তুমি খুব কম পাবে, বিশেষ করে যখন আমি ঘুমিয়ে থাকি। বাই!'

রবার্ট নেমে গেল কারণ ওর সেলফোন বাজছে। লোকটার বয়স বিরাশি? রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়? ভাবা যায় না। ওর বউকে দেখে অবশ্য বেশ বৃদ্ধা বলে মনে হয়। সকাল দুপুরে কুকুরকে চেনে বেঁধে বের হয় পটি করাতে। স্বামী-স্ত্রী মেয়ের বাড়িতে থাকেন। মেয়ে বিধবা, বুড়ি নাতিদের সামলান।

রবার্টের উৎসাহের সীমা নেই। ভোর সাড়ে ছ'টায় সেজেগুজে গাড়ি বের করে বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। এপাড়ার যেসব বাবা মা হঠাৎ কোনও সমস্যায় ছেলেমেয়েকে স্কুলে পৌঁছাতে পারেন না, তাঁদের ফোন আসে রবার্টের কাছে। দশ টাকার বিনিময়ে পৌঁছে দিয়ে আসে রবার্ট। একসঙ্গে তিন কি চারটে বাচ্চা পেলে ওর খুব আনন্দ। শুধু সকালে নয়, কেউ হয়তো এয়ারপোর্টে যাবে, রবার্ট আছে। পৌঁছে দিলে পঁচিশ ডলার। গাড়িটা ওর মেয়ের। তাকেও অফিসে পৌঁছে দেয়। নিয়ে আসে। রবার্ট হেসে বলে, 'এই ট্রিপটা বিনা পয়সার। মেয়ের মায়ের উচিত আমাকে কিছু দেওয়া।' রবার্টের কাছ থেকে আর একটা উপকার পায় অহনা। তার অনুপস্থিতিতে বাড়িতে কেউ এলে রবার্ট খোঁজখবর নিয়ে রাখে।

মেয়েকে ডাকল অহনা। তাকে এখন চারবার ডাকতে হবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। তখন একরাশ বিরক্তি নিয়ে মেয়ে বিছানা ছেড়ে বাথরুমে ঢুকবে। ঢোকার পর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও একঘণ্টার আগে বের হবে না। বাথরুম থেকে বেরুবার সময় অহনা এখন মেয়ের সামনে যায় না। লজ্জা বলে কোনও বোধ এই মেয়ের নেই।

এর পরে ঘরের দরজা বন্ধ থাকবে আধঘণ্টা। গলা থেকে পা পর্যন্ত তিনি পরিচর্যা করবেন। পারফিউম স্প্রে করবেন। ততক্ষণে চেঁচিয়ে অহনার স্বরভঙ্গ হওয়ার জোগাড়। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন বের হবেন তখন মনে হবে সিনেমার শ্যুটিং করতে যাচ্ছেন।

'তৃণা, আমি তোমাকে আজ শেষবার বলছি, নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নাও।'

'মানে?'

'আমি তোমাকে স্কুলে পৌঁছে দিতে পারব না। তুমি ভেবেছটা কী। আর মাত্র কুড়ি মিনিট আছে। এর মধ্যে ট্রাফিক বেড়ে গেছে। চল্লিশ মিনিটের রাস্তা কুড়ি মিনিটে পৌঁছে দিতে যে-টেনশন হয়, আমার পক্ষে তা নেওয়া সম্ভব নয়। আমার সঙ্গে স্কুলে যেতে হলে রেডি হয়ে ঠিক সাড়ে ন'টায় খাওয়ার টেবিলে এসে বসতে হবে। না হলে নিজে স্কুলে যাও।' অহনার মুখ লাল।

'তাহলে রবার্টকে বলো।'

'বাঃ। রবার্টকে দশ টাকা কে দেবে?'

'আজ আমি দিয়ে দেব।'

'অনেক টাকা তোমার, না? খেতে বোসো।'

'খাওয়ার সময় নেই।'

'আশ্চর্য! কাল রাত্রে খাওনি, সকালেও না খেয়ে স্কুলে যাবে!'

'কথা বাড়াচ্ছ কেন? এমনিতেই হাতে বেশি সময় নেই।' মেয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দ্রুত চিকেন স্যান্ডুইচ আর জলের বোতল প্যাকেটে ঢুকিয়ে গাড়ির চাবি, বাড়ির চাবি নিয়ে নীচে নেমে এল অহনা।

'দয়া করে গাড়িতে বসে খেয়ে আমাকে উদ্ধার করো।'

'হোয়াট ইজ উদ্ধার?'

'তুমি খেয়ে আমাকে অবলাইজ করো।' গাড়ির দরজা খুলে স্টিয়ারিং-এ বসল অহনা। বসেই আয়নায় নিজের মুখ দেখে চমকে উঠল। যেমন ছিল তেমন অবস্থায় বেরিয়ে এসেছে। চুলে চিরুনি দেওয়ার সময় পায়নি। পরনে বাড়ির পোশাক। নাহয় গাড়ি থেকে নামতে হবে না, কিন্তু আশেপাশের গাড়ির লোক তো তার মুখ দেখবে।

'আমি বুঝতে পারছি না। আমার খাওয়ার সঙ্গে তোমার অবলাইজড হওয়ার কী সম্পর্ক! মাঝে মাঝে তুমি যে কীরকম কথা বল!' তৃণা বলল।

উত্তর দিল না অহনা। বেশ জোরে চালাতে গিয়েই স্পিড কমিয়ে আনল। এই রাস্তায় পঁচিশ স্পিড তুললেই পুলিশ নজর রাখবে। মেয়ের জন্যে টিকিট খেতে চায় না সে।

'মা, আর একটু জোরে চলো। আর আট মিনিট আছে।'

অহনা উত্তর দিল না। এখন জোরে চালানোর কোনও উপায় নেই। অফিসের ভিড় এখন তুঙ্গে। তা ছাড়া দেড় মিনিট যেতে না যেতেই লাল আলোয় থমকাতে হয়। মেয়ের গলা করুণ হল, 'সাড়ে দশটা বেজে গেলে ঢুকতে দেবে না।'

'তাতে যদি তোমার শিক্ষা হয়।' চোয়াল শক্ত হল অহনার।

'আমি তো অন্য মেয়েদের মতো অ্যাডভেঞ্চার করি না। শুধু বাথরুমে বেশিক্ষণ থাকি আর—।'

'বাথরুমে কী কর? ঘুমাও?'

তৃণা উত্তর দিল না। অহনার খেয়াল হল, 'অন্য মেয়েরা স্কুলে কী অ্যাডভেঞ্চার করে?'

'স্কুলে নয়।'

'তাহলে?'

'বাইরে। বয়ফ্রেন্ডদের সঙ্গে। একজন কনসিভ করে গেছে। বুঝতে পারেনি। এখন তাকে নিয়ে সবাই কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। ওরা ঠিক করেছে মেয়েটাকে সাথে নিয়ে ছেলেটার বাবা মায়ের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইবে।' নির্লিপ্ত গলায় বলল তৃণা।

ঢোঁক গিলল অহনা। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। তারপরেই মনে পড়ল গতরাত্রে দেখা কমপিউটারের ছবির কথা। মনে পড়তেই শরীর শক্ত হল। কিন্তু বলতে গিয়েও পারল না অহনা। গাড়ি ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে স্কুলের সামনে। সেখানে তখন গাড়ির ভিড়। দরজা খুলে দৌড়াল তৃণা। এই গাড়ির দঙ্গলটা ওর কাজে লাগবে। বলতে পারবে অনেকটা হেঁটে আসতে হয়েছে সামনে গাড়ির সারি থাকায়।

'গুড মর্নিং মিসেস আমিন।'

মুখ ফেরাল অহনা। তৃণার সহপাঠিনী আলিশার মা পাশের গাড়িতে।

'গুড মর্নিং!'

'এখানে এত গাড়ির ভিড় জমে যায়, আমাদের উচিত একসঙ্গে প্রিন্সিপ্যালের কাছে গিয়ে কমপ্লেন করা। তাই না?'

মাথা নাড়ল অহনা।

'ওহো! কনগ্রাচুলেশন। তৃণা নাকি খুব ভাল রেজাল্ট করেছে।'

'এমন কিছু ভাল নয়।'

'আমার মেয়ে তো মোস্ট অর্ডিনারি। হবে না কেন? ওর বাবার তো ব্রেন বলে কিছু নেই।'

অহনা কোনও মতে ভিড় থেকে গাড়ি বের করে আনতে পারল। গতকাল ভেবেছিল তৃণাকে পৌঁছে দিয়ে বাজার করে বাড়ি ফিরবে। আজ যে-অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে তাতে গাড়ি থেকে নেমে কোনও স্টোরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছে না সে।

সামনে যে রেডলাইট জ্বলছে এবং একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে, তা লক্ষ করেনি অহনা। অন্যমনস্কতা কাটিয়ে ব্রেকে সজোরে চাপ দিতে দিতে তার গাড়ি সামনের গাড়ির পেছন স্পর্শ করে ফেলল। অহনার মাথা সজোরে লাগল স্টিয়ারিং-এ। এবং তখনই অন্ধকার দেখল সে। আশেপাশে এবং পেছনে

অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যে। যে-গাড়িতে ধাক্কা লেগেছিল তার দরজা খুলে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন রাগী মুখে। অহনার জানলার পাশে এসে ইংরেজিতে বললেন, 'যে আপনাকে লাইসেন্স দিয়েছিল সে বলেনি গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকা উচিত?'

অহনা মুখ তুলতে পারছিল না। সে কোনও মতে বলল, 'আমি, আমি—।'

'বাঙালি?'

'হুঁ।'

'দয়া করে সিটবেল্ট পরে ফেলুন! জলদি। পুলিশ আসছে।'

ভদ্রলোকের গলায় এমন কিছু ছিল যে অত যন্ত্রণার মধ্যেও অহনা হাত বাড়িয়ে বেল্টের দুই প্রান্ত এক করে দিতে পারল।

'আপনার কি খুব আঘাত লেগেছে?'

মাথা তুলল অহনা, চোখ বন্ধ করেই বলল, 'এমন কিছু না। আমি খুব দুঃখিত।'

এইসময় অফিসার এসে গেলেন, 'কী হয়েছে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এই ভদ্রমহিলার গাড়ির ব্রেক বোধহয় গোলমাল করেছে। মনে হচ্ছে মাথায় চোট পেয়েছেন।'

'ওটা আপনার গাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'উনি আপনার গাড়ি ড্যামেজ করেছেন আর সেটা না বলে ওঁর মাথার চোটের কথা বলছেন? ওকে চেনেন?'

'না অফিসার, আমি মনে করছি উনি ইচ্ছে করে ঘটনাটা ঘটাননি।' আশেপাশের গাড়িগুলো আলোর সংকেত বদলাতেই সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে গেল। অফিসার অহনার কপালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাথা তো ফুলে উঠেছে। স্টিয়ারিং অবধি ওটা গেল কী করে? নিশ্চয়ই বেল্ট লাগাননি? বেল্ট থাকলে মাথা ওই পর্যন্ত যাবে না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'অফিসার ওর কোমরে এখনও বেল্ট বাঁধা আছে। আর বেল্টের কথা যদি বল তার চরিত্র কখন কীরকম হবে কেউ বলতে পারে না। হয়তো ইলাস্টিসিটি লুজ হয়ে গিয়েছিল—।'

'মাই গড! আপনার গাড়ির ক্ষতি হয়েছে অথচ আপনি ওঁর হয়ে কথা বলছেন! কোনও কমপ্লেন করবেন না?'

'কমপ্লেন করব না। আপনাকে ঘটনাটা জানাচ্ছি যাতে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সারাবার খরচটা দেয়।'

অফিসার অহনাকে একশ ডলার ফাইন এবং সতর্ক করলেন।

ভদ্রলোকের নাম অর্জুন দত্ত। পুলিশের ঝামেলা মিটে গেলে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি গাড়ি চালাতে পারবেন?'

'পারব।'

'আপনি কিন্তু এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসেননি।'

'মানে?'

'তাহলে নীচে নেমে দেখতেন আপনার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা।'

'দেখে কী হবে! ক্ষতি হলে গ্যারাজে দেব।'

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে অহনার হাতে দিয়ে অর্জুন বললেন, 'যদি কোনও প্রয়োজন হয় তাহলে ফোন করবেন। আর হ্যাঁ, যাওয়ার পথে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে যান। মাথায় চোট লাগলে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। '

বাড়ি আসার পথে খুব ধীরে গাড়ি চালাল। তার ফলে মৃদু হর্নের ধমক শুনতে হল কয়েকবার।

বাড়িতে ঢুকে বরফ বের করে খানিকক্ষণ কপালে ঘষল অহনা। সুপুরির মতো ফুলেছে জায়গাটা। মাথায় চোট লাগাকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। অর্জুন দত্ত বলে গেল। নিজের গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও চেঁচামেচি রাগারাগি না করে পুলিশের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। তার বদলে যদি কোনও পুরুষ ড্রাইভার হত তাহলেও কি উনি একই ব্যবহার করতেন? ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের আশেপাশে। চেহারা দেখে বোঝা যায় ভালই আছেন এবং সংসারের কোনও ঝামেলা সামলানোর দায়িত্ব নেন না। ইনি অবশ্যই বিবাহিত এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ইনি বেশ বিপজ্জনক ব্যক্তি।

লম্বা ডিভানে পা ছড়িয়ে শুলে বেশ আরাম লাগে অহনার। কপালের দপদপানি একটু কমলে সে ডিভানে শরীর এলিয়ে দিল। ঘণ্টা দুই-তিন পরেও যদি কষ্ট থাকে তাহলে ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে। আজ-কালের মধ্যে মরে গেলে তৃণা ভেসে যাবে। মেয়েটাকে একটা নিশ্চিত জায়গায় দাঁড় না করানো পর্যন্ত তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। অদ্ভুত ব্যাপার! এখন তাকে বেঁচে থাকার কারণ হিসেবে মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হচ্ছে!

এই নিউইয়র্ক শহরে এত মানুষ থাকতেও কী ভয়ংকর একা লাগে মাঝে মাঝে। এই যেমন এখন। যারা জ্যাকসন হাইটে থাকে তাদের নাকি এরকম অনুভূতি হয় না। তারা জায়গাটাকে প্রায় বাংলাদেশ বানিয়ে ফেলেছে। ফুটপাতে হাঁটলেই বাংলা শব্দ শোনা যায়, তা ফরিদপুর অথবা চট্টগ্রামের হোক, কিছু যায় আসে না। আসলে শব্দগুলোয় বাংলার গন্ধ জড়ানো। রেস্টুরেন্টে ঢুকলে স্বচ্ছন্দে বলতে পারে ভাত, আলুভাজা, ফুলকপির সবজি আর মাছের ঝোল খাব। এরপরে আর আমেরিকা তাদের কাছে বিদেশ বলে মনে হবে কেন?

অহনার হয়। ঢাকায় মা-বাবার সঙ্গে থেকেই আচমকা যে একাকীত্ব প্রবল হয়ে উঠত, সেটা ছিল মনের ভেতরকার মনের কারণে। কিন্তু নিউইয়র্কে তো সেই ভেতরকার মনটা কফিনে শুয়ে আছে। এই যে এখন, কপালে চোট পেয়ে সে ডিভানে শুয়ে আছে, এইসময় কাউকে ফোন করে যদি বলে খুব খারাপ লাগছে, একটু এসো তাহলে সে নিশ্চয়ই না বলবে না। তবে আসবে বিকেল ছ'টায়, কাজের শেষে। কাজ হারাবার ভয় এখানে এত তীব্র যে, ব্যক্তিগত সেন্টিমেন্টের কোনও দাম নেই। হ্যাঁ, লিটনকে বলা যায়। হয়তো কোনও শপিং মলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছে এখন, ফোন পেতেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চলে আসবে, ও আসার পরই তো আর একটা খারাপ লাগা শুরু হয়ে যাবে। বউ একের পর এক প্রেম করে যাচ্ছে এবং সেটা শুধু শারীরিক আনন্দ পাওয়ার জন্যে, জেনেশুনেও হজম করে যে-পুরুষ তার চারপাশে অবশ্যই বিষাদ ছাড়া আর কিছু নেই। কেন মীনাকে ডিভোর্স করবে না লিটন তা আজও ওর মুখ থেকে বের করা গেল না।

কথাটা ভাবতেই হাসি পেল অহনার। লিটন ডিভোর্স করলে তার কী লাভ? লিটনকে তো সে কোনও নতুন জীবন দিতে পারবে না। ওকে নিয়ে এরকম ভাবনা ভাবাই যায় না। বেল বাজল।

এখন ভরদুপুর। এই সময় ক্যুরিয়র বা পোস্টঅফিসের লোক ছাড়া কারও আসার কথা নয়। অহনার ইচ্ছে করছিল না ডিভান ছেড়ে উঠে নীচে নামতে। বাজুক, কয়েকবার বাজাবার পরে কেউ বাড়িতে নেই ভেবে নিশ্চয়ই চলে যাবে লোকটা। কাজের প্রয়োজনেই দ্বিতীয়বার আসবে আগামীকাল। অহনা উঠল না। বেল বাজল বার চারেক। তারপরেই তার সেলফোন আর্তনাদ করে উঠল।

বোতাম টিপে কানে চেপে খুব আস্তে 'হ্যালো' বলল অহনা।

'তুমি এখন কোথায়?' রবার্টের গলা।

'কেন?'

'আরে দু'জন লোক তখন থেকে তোমার ডোরবেল বাজাচ্ছে—।'

'কারা?'

'জানি না। একজন পুরুষ অন্যজন মহিলা। দাঁড়াও, জিজ্ঞাসা করছি।' সেলফোন অফ হয়ে গেল। না, এরা ক্যুরিয়র অথবা পোস্টঅফিসের লোক নয়। হঠাৎই মনে পড়ল নতুন ভাড়াটের বাড়ি দেখতে আসার কথা ছিল। কিন্তু ফোন না করে আসবে?

অহনা উঠল। চুল আঁচড়াল। কপালের ফোলাটা কি একটু কমেছে? বুঝতে পারল না সে। তারপর ধীরে সুস্থে নীচে নামল।

'আপনাকে এইসময় বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আমার নাম টম জোন্স। ইনি আমার স্ত্রী।' ভদ্রলোক পরিচয় দিলেন।

পেছনে দাঁড়ানো রবার্ট বলল, 'মাই গড! তোমার কপালে কী হয়েছে?'

'একটু চোট লেগেছে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আই অ্যাম সরি, তোমাদের দাঁড়াতে হয়েছে, তবে ফোন করে এলে এই অসুবিধাটা হত না।'

'আমি সেলফোন ব্যবহার করি না। আমার স্ত্রী করেন। এবং তিনি তাঁর পাঁচ নম্বর সেলফোনটা আজ হারিয়ে ফেলেছেন।' ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন।

অহনা ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল। লম্বায় অন্তত পাঁচ নয়, খুব ভাল ফিগার, প্যান্ট এবং গেঞ্জি পরা। গেঞ্জির বোতাম খোলা রাখায় বুকের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। চোখ ঢুলুঢুলু। ঠোঁটের ভঙ্গি দেখে মনে হয় হাসছেন।

'রবার্ট!' অহনা ডাকল।

'ইয়েস।'

'তুমি যদি দয়া করে ওঁদের ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে দাও—! আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। আই অ্যাম সো সরি—!'

'আরে ঠিক আছে, ঠিক আছে।' রবার্ট এগিয়ে এল, 'চলুন, আমাদের তিনতলায় যেতে হবে। চাবি কোথায় আছে?'

'দরজায় তালা দেওয়া নেই।' অহনা বলল।

রবার্ট ওদের নিয়ে তিনতলায় উঠে গেলে অহনা নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকল।

ভাড়াটে হিসেবে এরা খারাপ হবে না। দু'জনের বেশি যদি লোক না থাকে তাহলে জল নিয়ে সমস্যা হবে না, চিৎকার চেঁচামেচিও কম হবে। লোকটাকে দেখলেই অবশ্য পুলিশ বলে মনে হয়। একজন পুলিশ অফিসার বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে থাকলে মনের জোরও বাড়বে।

এখন প্রশ্ন উঠবে ভাড়া নিয়ে। আগের ভাড়াটে আঠারোশো দিত। তার নীচে সে ভাড়া দেবে না। চারটে বাঙালি ছেলে ফ্ল্যাটটা নিতে চেয়েছিল। চারজনে মিলে দু'হাজার দিত। রাজি হয়নি অহনা। গার্ল ফ্রেন্ড বলে নিত্যনতুন মেয়ে নিয়ে আসবে। তাই নিয়ে ঝামেলা হবে।

একটু পরে ওদের নিয়ে রবার্ট নেমে এল। ঘরে ঢুকে সোফায় বসতে বলে রবার্ট জানাল, 'ওদের ফ্ল্যাট ভারী পছন্দ হয়েছে।'

অহনা তাকাতে টম জোন্স মাথা নাড়ল, 'গুড! বেশ ভাল। কিন্তু—।'

সঙ্গে সঙ্গে রবার্ট বলল, 'এই তো মুশকিল। আপনি ভাল ফ্ল্যাটে আনন্দে থাকবেন, হাওয়া রোদ উপভোগ করবেন অথচ তার জন্যে দাম দিতে গেলে চিন্তায় পড়বেন?'

'সে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার বাজেট যদি পারমিট না করে—!'

'তাহলে নেবেন না।' রবার্ট মাথা নাড়ল, 'আমি আপনাকে চব্বিশ বলেছি, ওকে বাইশ দেবেন। কী বল অহনা? মাই ডটার!'

অবাক হতে গিয়েও হেসে ফেলল অহনা।

মিসেস জোন্স বললেন, 'ওঃ ডার্লিং! ফ্ল্যাটটা এত ভাল। তুমি একুশ অফার করো। মিসেস আমিন, আপনি একুশে রাজি হবেন নিশ্চয়ই!'

'বেশ।' অহনা মাথা নাড়ল।

এক দিন সময় নিল ওরা। এর মধ্যে কাগজপত্র তৈরি করিয়ে ফেলবে অহনা। জোন্স তার অফিসের ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিয়ে বউকে নিয়ে চলে গেল।

রবার্ট বলল, 'আশা করি আমরা এখন কফি খেতে পারি।'

'না।' অহনা গম্ভীর।

'কী আশ্চর্য! আমার জন্মদিনে কী সুন্দর ঘটনা ঘটছে। প্রতি মাসে তুমি তিনশো ডলার বাড়তি রোজগার করবে বলে ভেবেছিলে?' রবার্ট চোখ বড় করল।

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমার মাথায় যন্ত্রণা করছে, একা থাকতে দাও।'

এগিয়ে এসে অহনার কপালটা দেখল রবার্ট, 'মাই ডিয়ার লেডি, এখনই হাসপাতালে চলো। নইলে পরে বিপদে পড়বে।'

'হাসপাতালে যাওয়ার মতো কিছু হয়নি। তুমি বিদায় হও এখন।'

রবার্ট বেরিয়ে গেলে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল অহনা। কপালের ব্যথা বেশ তীব্র কিন্তু সেই সঙ্গে খিদেও পাচ্ছে। এখন যদি ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে গোটা দিনে পেটে কিছু পড়বে না। দেশে থাকলে কেউ এমনটা ভাবতেই পারত না। ঘুম থেকে উঠে চা বা কফি ছাড়া একটা মানুষ কিছু না খেয়ে দিব্যি বেঁচে থাকে এদেশে। খাবার নেই বলে খাওয়া হচ্ছে না, তা নয়। খেতে ইচ্ছে করছে না বলে খাওয়ার কথা ভুলে থাকে অনেকে। দেশে এইরকম পরিস্থিতিতে মা-কাকিমারা জোর করে খাইয়ে দিত। একটা মানুষ না খেয়ে থাকবে তাঁরা ভাবতেই পারতেন না।

ঘুম ভাঙল চারটের কিছু পরে। তৃণার টেলিফোনে। তার স্কুল ছুটি হয়ে গেছে এবং সে মায়ের জন্যে অপেক্ষা করছে।

অহনা উঠতে চাইল কিন্তু তখনই মনে হল জ্বর এসে গেছে। এদেশে অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকা বিলাসিতা। কিন্তু—। মেয়েকে বলল, 'তুই রবার্টকে ফোন কর। আমার শরীরটা খারাপ লাগছে মা।'

রবার্ট ফোন পেতেই পৌঁছে গিয়েছিল। গাড়িতে তুলে বলেছিল, 'হাই বেবি। আজ আমার জন্মদিন।'

'ওঃ কাম অন। বছরে ক'বার জন্মদিন হয় তোমার?'

'নো নো। আজ একেবারে সত্যিকারের জন্মদিন।'

'দেন, হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ। জন্মদিনে খাওয়াও।'

'খাওয়াব?' হকচকিয়ে গেল বৃদ্ধ।

'হ্যাঁ। আই অ্যাম হাংরি।'

অতএব একটি ম্যানডোনাল্ডে গাড়ি পার্ক করল রবার্ট। তৃণা প্রতিবাদ করল, 'না না। এখানে না। পিৎজ্জা হাটে চল।'

'মাই লিটল ডার্লিং। এই বুড়ো মানুষটার পকেটের কথা ভাব?'

'তুমি তাহলে স্বীকার করছ যে বুড়ো হয়েছ?'

'খরচের কথা উঠলেই নিজেকে বুড়ো মনে হয়। নইলে, ইউ নো—।'

তৃণার ব্যাগে একটা অতিরিক্ত চাবি থাকে। সেটা দিয়ে দরজা খুলে ওপরে

উঠে এল। বাড়ি নিঃশব্দ। নিজের ঘরে ঢুকে পা ছুড়ে জুতো ফেলে আয়নার সামনে দাঁড়াল। তাকে আর ছয় থেকে সাত ইঞ্চি লম্বা হতে হবে। সে যখন মন দিয়ে নিজের মুখ দেখছে তখন কানে শব্দটা এল। কেউ বমি করছে। তখনই মনে পড়ল মা বলেছিল শরীর খারাপ। অথচ সকালে মা বেশ সুস্থ অবস্থায় তাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। কেউ বমি করলে তাকে কী ভাবে সাহায্য করা উচিত?

তৃণা ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমের দরজার সামনে এসে দেখল অহনা তোয়ালেতে জল মুছে টলতে টলতে নিজের ঘরে চলে গেল। তৃণা জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি কিছু করতে পারি?'

বাঁ হাতটা দ্রুত নেড়ে 'না' বলে চোখের আড়ালে অহনা চলে যেতে তৃণা নিশ্চিন্ত হয়ে বসার ঘরে এসে টিভি খুলল।

কিছুক্ষণ বাদে টেলিফোন বাজল। তৃণা রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে লিটনের গলা ভেসে এল, 'হাই তৃণা। কেমন আছিস?'

'খুব ভাল।'

'বাঃ। স্কুল থেকে এলি?'

'হ্যাঁ। রবার্ট নিয়ে এল।'

'ও। মা কি ব্যস্ত ছিল?'

'না, বলেছিল শরীর খারাপ হয়েছে।'

'তাই নাকি? জ্বরটর এসেছে?' লিটনের গলায় উদ্বেগ।

'না বোধহয়। কিন্তু বমি করার শব্দ শুনেছি।'

'বমি?'

'আই ডোন্ট নো লিটন আংকল—।'

'কী জানিস না?'

'আই ডোন্ট নো মা কনসিভ করেছে কিনা!'

'অ্যাঁ? কী যা তা বলছিস?

'কনসিভ করলে ভমিটিং টেন্ডেন্সি হয়। স্কুলে শুনেছি। তাই তো বললাম আমি ঠিক জানি না—!' তৃণা বলল।

'মাই গড!'

মিনিট চল্লিশেকের মধ্যে লিটন এসে গেল। অহনা যেতে চাইছিল না। লিটন জোর করে ওকে নীচে নামিয়ে গাড়িতে তুলল, জানলায় মাথা এলিয়ে

চোখ বন্ধ করে গাড়িতে বসেছিল অহনা। যেতে যেতে লিটন বলে যাচ্ছিল, 'মাঝে মাঝে মনে হয় দেশের অজ পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়েদের সঙ্গে তোদের মতো কিছু শিক্ষিত মেয়ের কোনও পার্থক্য নেই। মাথায় চোট লেগেছে, শরীর খারাপ করছে অথচ কাউকে কিছু না বলে সারাদিন শুয়ে থাকলি! তুই কত বড় ইডিয়ট!'

'আমি কাউকে বিরক্ত করতে চাই না।' চোখ বন্ধ করেই বলল অহনা।

'বেশ তো, নিজেই হাসপাতালে চলে যেতে পারতিস। অ্যাকসিডেন্টটার পরেই তোর যাওয়া উচিত ছিল।' লিটন বলল।

'যেতাম কিন্তু ওই ভদ্রলোক বারংবার বলছিলেন বলে গেলাম না।'

'কোন ভদ্রলোক?'

'যার গাড়ির সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।'

'পুলিশ ওর গাড়ির নাম্বার নিয়েছে?'

'জানি না। দোষটা আমার ছিল বলে আমাকেই ফাইন করেছে, উনি রেডলাইটে দাঁড়িয়েছিলেন, আমিই পেছন থেকে ওর গাড়িকে ধাক্কা মারি।'

'লোকটা আমেরিকান?'

'না, বাঙালি।' ব্যাগ খুলে অর্জুন দত্তের দেওয়া কার্ডটা লিটনকে দিল। লিটন কার্ডে চোখ বুলিয়ে শ্বাস ফেলল, 'যাচ্চলে!'

যেহেতু আমেরিকান সরকার তাঁদের দেশের শারীরিক এবং সোশ্যাল সিকিউরিটি হোল্ডারদের প্রতি দায়বদ্ধ তাই হাসপাতালে ঢোকার পাঁচ মিনিটের মধ্যে অহনার চিকিৎসা শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রাথমিক পরীক্ষার পর মাথায় স্ক্যান করা হল। রিপোর্ট অনুযায়ী ভয়ের কিছু পাওয়া যায়নি কিন্তু ডাক্তার চব্বিশ ঘণ্টা নজরে রাখবেন বলে অহনাকে হাসপাতালে থাকতে বললেন। এবং এই সময় নিরাপত্তার প্রশ্নটি উঠল। গাড়ি চালাবার সময় বেল্ট পরা বাধ্যতামূলক হয়েছে কারণ দুর্ঘটনা ঘটলে শরীরের কোনও অংশ এগিয়ে গিয়ে আঘাত পাবে না। যেহেতু অহনা বেল্ট পরে ছিল তাই তার মাথায় আঘাত লাগার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আঘাত লেগেছে। যদি সে বেল্ট না পরার কারণে আহত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আইন না মানার মামলা শুরু হবে। জরিমানা তো বটেই, বেশ কয়েক মাস তাকে গাড়ি চালাতে দেওয়া হবে

না। এদেশে গাড়ি চালাবার লাইসেন্স না থাকা মানে সমুদ্রে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়া। আর বেল্ট বাঁধা সত্ত্বেও সে যদি আঘাত পেয়ে থাকে তাহলে যে-কোম্পানি তার গাড়ি তৈরি করেছে তাদের বিশাল ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, কারণ বেল্ট ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ডাক্তার তাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'দুর্ঘটনার সময় আপনি কি বেল্ট পরেছিলেন? মনে করে বলুন।'

মিথ্যে কথা বলতে গিয়েও পারল না অহনা। আবার সত্যি কথা বলা মানে কয়েক মাস বা বছর বাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যা অসম্ভব ব্যাপার। সে মাথা নাড়ল, 'আমার মনে পড়ছে না।'

'চেষ্টা করুন মনে করতে।'

'বিশ্বাস করুন। মাথায় আঘাত লাগার সময়টা থেকে কিছুক্ষণ কী হয়েছিল তা আমার মনেই পড়ছে না।' অহনা বলেছিল।

'সেইসময় কেউ আপনাকে দেখেছিল? মনে করতে পারছেন?'

'হ্যাঁ। যে-গাড়িকে ধাক্কা মেরেছিলাম তার ড্রাইভার আর একজন পুলিশ অফিসার। ওঁরা আসার পর আমি কিছুটা ধাতস্থ হই।' অহনা বলেছিল।

হাসপাতালে ভরতি করে নেওয়া হল অহনাকে। তৃণার জন্যে ভেবে কূল পাচ্ছিল না অহনা। আজ পর্যন্ত ও কখনও রাত্রে একা থাকেনি। লিটন তাকে ভরসা দিল, সে একটা ভাল ব্যবস্থা করবে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে লিটন চলে গেল দুর্ঘটনা যেখানে ঘটেছিল সেই এলাকায় পুলিশ স্টেশনে। গিয়ে জানতে পারল, অফিসার রিপোর্ট দিয়েছেন দুর্ঘটনার সময় মিসেস অহনা আমিন বেল্ট পরে ছিলেন। তিনি লাল আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা মিস্টার অর্জুন দত্তের গাড়ির পেছনে ধাক্কা মারেন। মিস্টার দত্ত এ-ব্যাপারে কোনও কমপ্লেন করতে রাজি না হওয়ায় একটা টোকেন ফাইন করে মিসেস অহনা আমিনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

রিপোর্টের একটা কপি চেয়ে নিল লিটন। অহনা মনে করতে পারছে না, কিন্তু পুলিশ যখন রিপোর্টে বলছে ও দুর্ঘটনার সময় বেল্ট পরে গাড়ি চালাচ্ছিল তখন গাড়ির কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। সে তাদের পরিচিত এক উকিলকে ফোন করল। সব শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি নিশ্চিত থাক, অন্তত দশ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে। তবে আর একজন সাক্ষী পেলে ভাল হয়। যে-ভদ্রলোকের গাড়িতে ধাক্কা লেগেছিল তিনি যদি অফিসারকে সাপোর্ট করেন তাহলে কেস জোরালো হবে।'

অর্জুন দত্তের কার্ড দেখে সেলফোনের নম্বর টিপল লিটন।

'হ্যালো।'

'আপনি বাঙালি?'

'হ্যাঁ।'

'আদাব। আমার নাম লিটন। আপনার সঙ্গে কয়েক মিনিট সাক্ষাৎ করতে পারি?'

'কী ব্যাপারে?'

'আজ দুপুরে অহনা আপনার গাড়িকে ধাক্কা মেরেছিল। সে আমার পার্টনার। ওই ঘটনার পরে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়ে আছে। ওর ব্যাপারেই কথা বলতে চাই।'

'আপনি কোথায় আছেন এখন?'

'ইউনিয়ন টার্ন পাইক স্টেট হসপিটালের সামনে।'

'আমি কুইন্স বুলেভার্ড দিয়ে যাচ্ছি। আপনি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন, মিনিট বারোর মধ্যে পৌঁছে যাব।'

দশ মিনিট পরে গাড়ি পার্ক করে অর্জুন দত্ত নেমে এল। লিটন লক্ষ করল গাড়ির পেছনটা অটুট রয়েছে। অর্জুন চারপাশে তাকাচ্ছে দেখে সে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমি লিটন। আপনার গাড়ির ক্ষতি হয়নি?'

'ভালই হয়েছে। সেটা গ্যারেজে। এটা ভাড়া করা গাড়ি।' অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, 'ভদ্রমহিলা এখন কেমন আছেন?'

'চব্বিশ ঘণ্টা অবজারভেশনে রাখতে চেয়েছে। তখনই ডাক্তার দেখানো উচিত ছিল, বিকেলে বমি হয়েছে।'

'ওঃ। আমি ওঁকে বলেছিলাম ডাক্তারের কাছে যেতে!'

'বাঙালি মহিলারা সহজে ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না।'

'বলুন, কী করতে পারি!'

'আপনি শুধু বলুন, দুর্ঘটনার সময় অহনা বেল্ট পরে ছিল কিনা?'

অর্জুন বলল, 'বেল্ট পরা থাকলে মাথা কি স্টিয়ারিং-এ লাগে?'

'তার মানে ও বেল্ট পরে ছিল না। কিন্তু পুলিশ অফিসার বলেছেন ওর শরীরে বেল্ট ছিল! দেখুন, ও যদি বেল্ট ছাড়া গাড়ি চালিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করে থাকে তাহলে কয়েক মাস ওর লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হবে। অহনা ডিভোর্সি, একটি মাত্র মেয়েকে নিয়ে একা থাকে। গাড়ি চালাতে না পারলে বিপদে

পড়বে।' লিটন বলল, 'আপনি কি বেল্ট দ্যাখেননি?'

'তিনি কী বলছেন?'

'ও বলছে, আঘাত পাওয়ার পর কিছু মনে করতে পারছে না।'

অর্জুন হাসল, 'দেখুন, পুলিশ আইনের রক্ষক। পুলিশ যখন বলছে উনি বেল্ট পরা অবস্থায় গাড়িতে ছিলেন তখন সেটাই সত্যি ভাবা উচিত।'

'তার মানে, ওকে বেল্ট পরা অবস্থায় আপনি দ্যাখেননি?'

'সত্যি কথা হল, না।'

'তাহলে পুলিশ দেখল কী করে?'

'পুলিশ ওঁর পাশে পৌঁছবার আগেই আমি ওঁকে বেল্টের কথা মনে করিয়ে দিই এবং উনি ঘোরের মধ্যে থেকেও সেটা পরে নেন।'

'ওঃ।' লিটন হতাশ হল।

'আপনি কি চাইছেন আমিও বলি উনি বেল্ট পরেছিলেন!'

লিটন তাকাল। চট করে হ্যাঁ বলতে পারল না।

'উনিও কি চাইছেন আমি এই স্টেটমেন্ট দিই?' অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

'না। ও এসব কথা জানে না। আলোচনাই করিনি।'

'দেখুন, আপনি বোধহয় ক্ষতিপূরণ চাওয়ার কথা ভাবছেন। কোনও কারণে যদি বেল্টের ইলাস্টিসিটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মাথায় আঘাত লেগে থাকে তাহলে বেল্ট পরীক্ষা করলেই সেটা বোঝা যাবে। যদি বেল্ট ঠিক থাকে তাহলে আমরা মিথ্যে স্টেটমেন্ট দেওয়ার অভিযোগে পড়ব।' অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়িটা কোথায়? উনি কি গ্যারেজে দিয়েছেন?'

'না। ওর বাড়ির সামনেই পার্ক করা আছে।'

'কতদূরে বাড়ি?'

'কাছাকাছি।'

'আপনার কি হাসপাতালে থাকা প্রয়োজন?'

'না না। এখন তো ঢুকতেও দেবে না।'

'যদি কিছু মনে না করেন তাহলে গাড়িটাকে দেখতে চাই।'

লিটনের গাড়িকে অনুসরণ করে অর্জুন অহনার বাড়ির সামনে এল। অহনার গাড়ির সামনের গার্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওটাকে পালটাতে হবে। এ ছাড়া গাড়ি ঠিক আছে। ড্রাইভিং সিটের বেল্ট টেনে দেখা গেল সেটা চমৎকার অবস্থায় আছে। পরা থাকলে কখনওই মাথা স্টিয়ারিং পর্যন্ত পৌঁছবে না।

অর্জুন বলল, 'ক্ষতিপূরণ চাইতে হলে এই বেল্টটাকে টেনে টেনে অনেকটা লম্বা করতে হবে। তারপর উকিলকে খবর দিলে তিনি যা যা করবার তার ব্যবস্থা করবেন। আপনি তো আমার নাম্বার জানেন। ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করে কাল আমাকে ফোন করবেন।'

অর্জুন চলে গেলে।

বেল বাজাল লিটন। চারবারের বার ব্যালকনিতে এল তৃণা, 'ওঃ, তুমি! ভেতরে আসবে?'

'হ্যাঁ। দরজা খোল।'

ওপর থেকে চাবি ফেলে দিল তৃণা।

ঘরে ঢুকে লিটন জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কিছু খেয়েছিস?'

'বার্গার।'

'কফি খাবি?'

'না।'

'শোন। তোর মাকে আজ হাসপাতালে থাকতে হবে। তুই ইচ্ছে করলে আমার বাড়িতে যেতে পারিস।' লিটন তাকাল।

'না না। আমি এখানে ঠিক থাকব। '

'তাহলে আমি আসব।'

'কেন?'

'তোর একা থাকা ঠিক নয়।'

'কী হবে একা থাকলে?'

'কিছুই হবে না। ভয় পেতে পারিস।'

'আমি দরজা বন্ধ করে রাখব।'

লিটন তৃণাকে দেখল, 'তোর মায়ের কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করলি না?'

'খারাপ কিছু হলে তুমি বলতে।' তৃণা তাকাল।

'তোকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ওর গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করে। তোর মায়ের মাথায় চোট লেগেছে। হাসপাতালে অবজারভেশনে রেখেছে।'

'ভাল হয়ে যাবে তো!'

'তোর কী মনে হয়?'

'হয়ে যাবে।'

কফি বানিয়ে খেল লিটন। মেয়েটা একা থাকতে পারবে কিন্তু তার কি

উচিত সেটা মেনে নেওয়া? অহনা খুশি হবে না। তা ছাড়া ওর টিচার তো হঠাৎ এসে যায়। খালি বাড়িতে ওই বয়সি মেয়েকে একা থাকতে দেওয়া উচিত নয়। লিটন ঠিক করল আজ রাত্রে বাড়িতে ফিরবে না। এই বসার ঘরের সোফায় শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবে।

'তুই পড়তে বসবি না?'

'একটু ঘুমাব, তারপর—!'

ফোনটা শব্দ করে উঠল। এখন রাত সাড়ে ন'টা, দিনের আলো সবে নিভেছে, এখনও 'সান্ধ্য'র অন্ধকার নামেনি। তৃণা লাফিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল, 'হাই! ও ড্যাড? কেমন আছ? আই অ্যাম ফাইন। সত্যি? সত্যি? কতক্ষণের মধ্যে আসছ? আমি এক্ষুনি রেডি হয়ে নিচ্ছি। বাই।'

এক মুখ হাসি নিয়ে তৃণা বলল, 'ড্যাড আসছে। আমাকে ডিনার খাওয়াতে নিয়ে যাবে। আমি আসছি—।' তৃণা দৌড়ল নিজের ঘরের দিকে।

হাঁ হয়ে বসে থাকল লিটন। মা হাসপাতালে অথচ মেয়েটার মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই? নাচতে নাচতে ডিনার খেতে চলল? অথচ ওই মেয়ের জন্যে অহনা সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় রয়েছে!

অহনার স্বামীকে লিটন কখনও দ্যাখেনি। ভদ্রলোক এই বাড়িতে ঢোকেন না। মেয়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হলে ফোন করেন। গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করেন বাড়ির সামনে। তৃণা নেমে যায়। যখন ফিরে আসে তখন একরাশ গিফট তার হাতে।

অহনার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেনি লিটন। এটা ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে এক রাত্রে, রাত তখন সাড়ে বারোটা, শুক্রবারের রাত, অহনা ফোন করেছিল লিটনকে, 'মেয়েকে ওর বাবা সাড়ে সাতটায় ডিনার খাওয়াতে নিয়ে গেছে। এখনও ফেরেনি। সেলফোন বন্ধ। কী করা যায় বল তো।'

'অপেক্ষা কর।'

'আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'ওর বাবার সেলফোনে কথা বল।'

'না। আমি নিজে থেকে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলি না।'

'তাহলে অপেক্ষা না করে উপায় কী!'

'মেয়েটা কলেজে চলে গেলে আমি বেঁচে যাই।' বলে ফোন নামিয়ে রেখেছিল অহনা।

লিটনের অনুমান, অহনা মেয়ের জন্যে কোনও টাকা ভদ্রলোকের কাছ থেকে নেয় না। ভদ্রলোক আবার বিয়ে করেছেন কিনা তাও ওর জানা নেই, কেন, কী কারণে ওদের ডিভোর্স হল তা নিয়েও কখনও আলোচনা করেনি অহনা। আজ তাকে অহনার মতো জেগে থাকতে হবে তৃণার ফিরে আসা পর্যন্ত।

রাত বারোটা নাগাদ সেলফোন বাজল। টিভিতে একটা ছবি চলছিল, শব্দ কমিয়ে সেলফোনের বোতাম টিপতেই মীনার গলা কানে এল, 'কোথায় তুমি?'

গলার স্বরে বোঝা গেল সে খুব বিরক্ত।

'কেন?'

'আমি ঘরে ঢুকতে পারছি না। চাবি হারিয়ে ফেলেছি। তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

'আমার পক্ষে এখনই বাড়ি ফেরা সম্ভব হবে না।'

'কেন? কী রাজকার্য করছ তুমি? নিশ্চয়ই কোনও মেয়েমানুষ তোমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে নেই!' হিসহিসে গলা মীনার।

'থাকলে তুমি বোধহয় খুশি হতে।' লিটন হাসল।

'হ্যাঁ হতাম। তাহলে বুঝতাম তুমি পুরুষ মানুষ।' লাইন কেটে দিল মীনা। সে পুরুষ কি না, তাতে মীনার যে কিছুই এসে যায় না তা লিটন জানে। আঘাত করার জন্য এইসব বাক্য ব্যবহার করতে খুব পছন্দ করে সে।

একজন মহিলা যে বন্ধুর সঙ্গে নায়াগ্রা বা ফ্লোরিডায় বেড়াতে গিয়ে বাড়ির চাবি হারিয়ে ফিরে এসে স্বামীর ওপর তড়পাতে পারে, তা মীনাকে দেখার আগে জানত না লিটন। চাবিটা মীনা বরাবর তার হাতব্যাগের ভেতরের খাপে রেখে দেয়। ব্যাগ না হারালে চাবি খোয়া যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাহলে কি ব্যাগ হারিয়ে ফিরে এসেছে মীনা! অবশ্য দরজা বন্ধ বলে সে বিপদে পড়বে না। পাশের ফ্ল্যাটের পাকিস্তানি ভদ্রলোক ইউসুফ ভাইদের সঙ্গে ওর ভাল সম্পর্ক। ইচ্ছে করলে ওদের ফ্ল্যাটে গিয়ে ঘুমাতে পারে।

তবু কিছুক্ষণ বাদে তৃণাকে ফোন করবে বলে ঠিক করল লিটন। ওর যদি ফিরতে দেরি থাকে তাহলে—। কিন্তু তার আগেই তৃণার ফোন এল।

'আঙ্কল, আমি তৃণা। ড্যাডি বলছে আজ রাত্রে ওঁর সঙ্গে থাকতে। বাড়িতে

মা নেই, আমি তাহলে কাল সকালে ফিরে যাব। তুমি লক করে চলে যাও। গুড নাইট।' টানা কথাগুলো বলে লাইন অফ করে দিল তৃণা।

শহরটা নিউইয়র্ক হলেও রাত বারোটার পর রাস্তা বেশ ফাঁকা হয়ে যায়। গাড়ি চালাতে চালাতে অহনার কথা ভাবছিল লিটন। এই মেয়ের কাছে অহনা যদি কিছু আশা করে থাকে, তাহলে ওর চেয়ে নির্বোধ মানুষ পৃথিবীতে নেই। শুধু তৃণা কেন, এই প্রজন্মের বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে শুধু পেতে জানে, দিতে নয়। হয়তো তাদের বাবা-মায়ের সম্পর্কহীনতার কারণে এই মানসিকতা নিয়ে বড় হয়।

বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে কয়েকধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই মীনাকে দেখতে পেল লিটন। বন্ধ দরজার পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে সিগারেট খাচ্ছে।

'ওখানে বসে আছ কেন?'

'তুমি কি এখানে কোনও সিংহাসন রেখে দিয়েছ?' খেঁকিয়ে উঠল মীনা।

দরজা খুলল লিটন। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল। মীনা পায়ের জুতো দু'দিকে ছুড়ে সিগারেটটা টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে ঢুকে গেল বাথরুমে। লিটনের কানে শাওয়ারের শব্দ এল।

কিন্তু মীনা ব্যাগ নিয়ে ভেতরে ঢোকেনি। সেটা নিশ্চয়ই হারিয়েছে। অথচ ব্যাগের ব্যাপারে ও খুব সতর্ক থাকে সবসময়। লিটন জানে এ-ব্যাপারে আগ্রহ দেখালে তাকে কী শুনতে হবে। গ্লাসে অল্প ওয়াইন ঢেলে নীচের ঘরে চলে এল সে। জামাপ্যান্ট ছেড়ে পাজামা ফতুয়া পরে নিল। এই ফতুয়া তাকে অহনা কিনে দিয়েছিল। একসঙ্গে চারটে। অহনার বাবা ফতুয়া পরতেন।

বাথরুম থেকে মীনা বেরিয়েছে, শব্দে বোঝা গেল। তার পরেই প্রশ্নটা উড়ে এল, 'আমি না থাকলে এই বাসায় রান্না হয় না?

'প্রয়োজন হয়নি।'

'ফ্রিজটাও খালি! হায়, কী সংসারে বাস করছি।'

অর্থাৎ মীনা ক্ষুধার্ত। কিচেনে ডিম আছে। ইচ্ছে করলেই একটা বড় ওমলেট বানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু করবে না। করলে ওর বলার মতো কথা থাকবে না।

লিটন গ্লাস হাতে ঘরের বাইরে এসে থমকে গেল। একটু ঝুঁকে ফ্রিজ থেকে কিছু বের করছে মীনা। পেছন থেকে চোখ সরিয়ে নিল লিটন। মীনার শরীরে

এখন আব্রু নেই। এরকম নগ্ন অবস্থায় মীনাকে কখনও ফ্ল্যাটের ভেতর হাঁটাচলা করতে দ্যাখেনি লিটন।

'তুমি দশ মিনিট সময় দাও, আমি ম্যাকডোনাল্ড থেকে খাবার নিয়ে আসছি।'

'দরকার হবে না।' ডিম খুঁজে পেয়েছে মীনা।

ওই পোশাকহীন অবস্থায় দ্রুত একটা বড় ওমলেট বানিয়ে ফেলল মীনা। তারপর সেটাকে প্লেটে তুলে কাঁটা চামচ সমেত টেবিলে বসল। একটা টুকরো মুখে দিয়ে বলল, 'খুব খুশি হচ্ছ, তাই তো?'

'মানে?'

'যদিও আমি তোমার ওয়াইফ কিন্তু আফটার অল একজন মহিলা। বয়সও বেশি নয়। এই শরীরটাকে দেখতে দেখতে মদ খেতে ভাল লাগছে না?'

'মীনা!'

খেতে খেতে মাথা নাড়ল মীনা। নিজের মনেই কিছু বলল।

'তোমার ব্যাগ কি হারিয়ে গেছে?' না জিজ্ঞাসা করে পারল না লিটন।

'না।' জল খেল মীনা, 'চুরি হয়ে গেছে। অবশ্য যদি ওটাকে চুরি বলা যায়! পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেল। আবার দ্যাখো, পুরুষ ছাড়া মেয়েদের চলে না। অন্তত আমার তো নয়ই। কিন্তু এবার সত্যি সত্যি ঘেন্না ধরে গেছে। আমি খুব ভুল লোক বেছে নিয়েছিলাম।' টেবিল থেকে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল মীনা। ওঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

খুব কাহিল লাগছিল লিটনের। ওয়াইন শেষ করে শুয়ে পড়েছিল সে। আর শোওয়ামাত্র ঘুম চলে এল।

ঘুমটা ভাঙল টেলিফোনের আওয়াজে। বসার ঘরে ওটা যেন আর্তনাদ করছে। কোনও রকমে বিছানা থেকে নেমে রিসিভার তুলতে তুলতে লিটন দেখল অন্ধকারে ঘড়ির সময় জ্বলছে। রাত পৌনে তিনটে।

'হ্যালো।'

'হ্যালো।' লোকটা ইংরেজিতে বলল, 'মীনাকে ফোনটা দিন।'

'কে আপনি?'

'ওয়েল, ওকে বলুন, যে ফোন করছে সে খুব দুঃখিত। ওর ব্যাগটা নিয়ে আসা আমার উচিত হয়নি। এটা বললেই হবে।'

হঠাৎ ক্ষেপে গেল লিটন, 'এই শালা হারামির বাচ্চা। তুই নিশ্চয়ই বেজম্মা

তাই নিজের নাম বলতে পারছিস না! সাহস থাকে তো কাল সকালে এখানে আয়, তোকে জ্যান্ত অবস্থায় আমি দোজখে পাঠাব।' সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার নামিয়ে রাখল লোকটা। কলার আইডেন্টিটিতে ওর নাম্বার ফুটে উঠেছে। লিটন নাম্বার ঘুরিয়ে লোকটাকে ধরতে চাইছিল কিন্তু পেছন থেকে গলা ভেসে এল, 'বাঃ।'

লিটন তাকিয়ে দেখল মীনা ওর ঘরের দরজায়! তবে এখন আর বিবস্ত্রা নয়, পাতলা নাইটিতে ওর শরীর ঢাকা। মীনা হাসল, 'এত উন্নতি! ভাবতেই পারছি না। যা বলেছ তারপর আর ফোন করার দরকার নেই। বরং এদিকে এসো।'

রিসিভার রেখে লিটন মীনার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মীনা চোখের কোণে তাকাল, 'এই বীরত্বের জন্যে তুমি অন্তত কিছুক্ষণ আমার ঘরে কাটাতে পার।' এক ঝটকায় নাইটি খুলে ফেলল মীনা।

ঘুম থেকে ওঠা মাত্র ফুলের তোড়াটাকে দেখতে পেল অহনা। লাল গোলাপের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে গেল সে। হাত বাড়িয়ে কার্ডটা তুলে নিয়ে সামনে ধরল। 'ভবিষ্যতে গাড়িতে সতর্ক থাকার সুযোগ দেওয়ার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' তলায় লেখা অর্জুন দত্ত।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল আজ ভোরেই ফুল পৌঁছে দিয়েছে দোকানের লোক।

লিটন এল দশটার সময়।

'কীরে কেমন আছিস?'

'ভাল। তুই কাল রাত্রে তৃণার সঙ্গে ছিলি?'

'না।'

'সে কী! মেয়েটাকে একা রেখে চলে গেলি?'

'না। ওর বাবা এসে নিয়ে গিয়েছিল ডিনার খাওয়াতে। রাত্রে, প্রায় বারোটার সময় তৃণা যখন ফোনে জানাল ও বাবার কাছেই থেকে যাবে, তখন আমি বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম!'

'বাবার কাছে থেকে গিয়েছিল? তুই অ্যালাউ করলি কেন?'

'যা ব্বাবা! আমি অ্যালাউ করা বা না করার কে?'

'না না। ওর বাবার কোনও রাইট নেই রাত্রে মেয়েকে নিজের কাছে রাখার।

মাসে একদিন বেড়াতে বা খাওয়াতে নিয়ে যেতে পারে, তার বেশি নয়। আমি নেই বলে লোকটা চুক্তি ভঙ্গ করবে কেন?'

'উত্তেজিত হচ্ছিস কেন? মেয়ে তো তার বাবার কাছেই গিয়েছিল।'

'যাক না। আমাকে নিষ্কৃতি দিয়ে একেবারেই চলে যাক। উঃ, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আমাকে না খেলে এরা শান্ত হবে না।' অহন্যা বলল।

ততক্ষণে লিটনের চোখ পড়েছে গোলাপের ওপর। বলল, 'বাঃ, দারুণ তো!' কার্ডটা দেখে হাসল সে, 'ঠিক কথা। বারবার চান্স পাবি না। এবার সাবধানে গাড়ি চালাবি। লোকটা ভাল।'

'কোন লোকটা? না চিনেই ভাল বলে দিলি?'

'পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে তোকে বেল্ট পরতে বলেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'অথচ গাড়ির কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে তুই বেল্ট পরা অবস্থায় আহত হয়েছিস বলে স্টেটমেন্ট দিতে রাজি হয়নি। তবে তোর সঙ্গে পরামর্শ করে ওঁকে ফোন করলে হয়তো দিলেও দিতে পারেন।'

'তোকে বলেছেন উনি?'

'হ্যাঁ।'

'ক্ষতিপূরণ ক্লেম করার দরকার নেই।'

'কেন?'

'মিথ্যে কথা বলতে হবে। অ্যাকসিডেন্টের সময় বেল্ট পরে ছিলাম না।'

'কিন্তু পুলিশের রিপোর্টে বলা হয়েছে পরেছিলি।'

'আমি তো জানি।'

ডাক্তার এলেন। আজ অহনার মাথার ফোলা একটু কমে গেছে। ডাক্তার বললেন, 'আপনি খুব জোর রক্ষা পেয়েছেন। এখন আর কোনও সমস্যা হবে না। বাড়ি ফিরে যেতে পারেন।'

অহনা হাসল, 'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এটা—।' কপালে হাত দিল সে।

'আরও দিন দুয়েক লাগবে নর্মাল হতে। ও হ্যাঁ, আপনি কি ক্ষতিপূরণ ক্লেম করছেন? পুলিশ তো বলেছে আপনার শরীরে বেল্ট ছিল।'

'আমি একটু ভেবে ঠিক করব।'

বাড়িতে পৌঁছে লিটন যখন ফুলের তোড়াটাকে নামাচ্ছে তখন নিজের গাড়িটাকে দেখল অহনা। দেখে গালে হাত দিল, 'কী হবে!'

'গ্যারেজে দিয়ে আয়। ওরা ইন্স্যুরেন্স থেকে টাকা পেয়ে ঠিক করে দেবে।'

'তদ্দিন?'

'আর একটা গাড়ি ভাড়া কর। চল।'

ওপরে উঠে ঘড়ি দেখল অহনা। সাড়ে এগারোটা।

লিটন ফুলের তোড়াটা এক কোণে রেখে বলল, 'রান্নাবান্না করা আছে?'

মাথা নাড়ল অহনা, হ্যাঁ। তারপর উঠল, 'তৃণা ফিরেছে কিনা দেখি!'

'তুই বসে থাক, আমি দেখছি।'

'না। ও যে-অবস্থায় ঘরে থাকে, দেখতে গেলে লজ্জায় পড়ে যাবি।' অহনা এগিয়ে গেল।

তৃণার ঘরের দরজা বন্ধ। জোরে শব্দ করল অহনা। একবারে সাড়া দেওয়ার মেয়ে তৃণা নয়। তৃতীয়বারে চিৎকার ভেসে এল, 'কী?'

'দয়া করে ভদ্রমেয়ের মতো পোশাক পরে দরজা খোল।' অহনা ফিরে এল বসার ঘরে।

'এসেছে?' লিটন জিজ্ঞাসা করল।

'হুঁ।'

'কিছু বলিস না। চেঁচিয়ে কী হবে।'

'তুই খেয়ে যাবি?'

'না।'

'কেন?'

'ব্রেকফাস্ট করেছি।'

'হঠাৎ? মীনা ফিরে এসেছে?

'হ্যাঁ।'

'কোথায় গিয়েছিল?'

'জানি না। তবে এবার বোধহয় ভুল বুঝতে শুরু করেছে।'

অহনা তাকাল, 'তুই পারিস!'

তৃণা এল, 'তোমরা কখন এসেছ? আমি টেরই পাইনি। ও মা, বাবা জিজ্ঞাসা করছিল তোমার কী হয়েছে? আমি বলতে পারিনি ঠিক।'

অহনা বলল, 'তৃণা, আমার মনে হচ্ছে তোমার এখন থেকে বাবার কাছে থাকা উচিত। তাতে তুমি ভাল থাকবে।'

তৃণার মুখ হাঁ হয়ে গেল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আই অ্যাম সরি, মা।'

'কেন? তুমি তো বাবার সঙ্গে ভালই ছিলে। শুধু একরাত কেন? এখন থেকে পাকাপাকি ভাবে থাকো।' অহনা বলল।

'হোয়াট ইজ পাকাপাকি?' তৃণার চোখ ছোট হল।

হো হো শব্দ করে হেসে উঠল লিটন। হাসতে হাসতে বলল, 'সত্যি তো। এইসব খটমটে বাংলা আমেরিকান বাঙালিকে বললে ওরা কী করে বুঝবে!'

'তুই থাম।' ধমকাল অহনা, 'তুমি জান না যে তোমার বাবার বাড়িতে গিয়ে রাত্রে থাকা আমি পছন্দ করি না? এত সাহস হল কী করে তোমার?'

'তুমি থাকবে না বলে—!'

'কেন? লিটন আঙ্কল তো ছিল!'

'এই বাড়িতে তুমি ছাড়া কারও সঙ্গে কখনও থাকিনি, তাই—!' তৃণা বলল, 'আর কখনও এরকম করব না।'

লিটন বলল, 'ঠিক আছে। এর পরে আর কোনও কথা নেই। কিন্তু তৃণা, তুই তো জানিস যে তোর মায়ের শরীর খারাপ, অ্যাকসিডেন্টের জন্যে মাথা ফুলেছে, বমি হয়েছে, হাসপাতালে যেতে হয়েছে। অথচ তোর কোনও দুশ্চিন্তা হয়নি! মাকে একবারও জিজ্ঞাসা করেছিস, এখন কেমন আছে?'

'যাক। আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। যা।'

অহনা বলতেই তৃণা ফিরে গেল তার ঘরে।

লিটন হাসল। অহনা জিজ্ঞাসা করল, 'হাসির কী হল?'

'নাঃ। মেয়েটা এখনও ছেলেমানুষ।'

'ছেলেমানুষ? পেকে টইটম্বুর।'

'দূর। তুই কাল বমি করেছিলি। বমির শব্দ শুনে ও ভেবেছিল তুই বোধহয় কনসিভ করেছিস। ছেলেমানুষ না হলে এরকম ভাববে?'

'কী?' চিৎকার করে উঠল অহনা, 'তোকে ও একথা বলেছে?'

'আঃ। চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'আশ্চর্য! মা বমি করছে শুনে মেয়ে ভাবল একথা? ভাবতে পারল? ওঃ। আমি কার সঙ্গে বাস করছি!' অহনা মাথায় হাত দিল।

'তুই এত আপসেট হচ্ছিস কেন?'

'হব না? তুই ছাড়া এবাড়িতে ও কাউকে আসতে দেখেছে? আমি একা, ডিভোর্সি। ইচ্ছে করলেই আমি দশটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করতে পারি—।'

'অন্তত একটা তো পারিসই—।'

'ঠিক আছে। সেই একটাও কি আমি করেছি? শুধু ওর জন্যেও, ওকে বড় করার জন্যে নিজের কথা ভাবিনি। তুই কি মনে করিস একথা ও জানে না? সব জানে। ওর স্কুলের কোনও মেয়ে ওই বয়সেই প্রেগন্যান্ট হয়েছে। নিশ্চয়ই শুনেছে সে বমি করেছে। তা থেকে ভেবে নিয়েছে বমি মেয়েরা কনসিভ করলেই করে। অতএব মাও তাই করেছে। আমি কি আমার মা সম্পর্কে এইরকম কথা বলতে পারতাম?' হতাশায় ডুবে যাচ্ছিল অহনা।

'তোর উচিত ছিল বিয়ে করা।' উঠে দাঁড়াল লিটন।

'কাকে?' মুখ তুলল অহনা।'

'পছন্দমতো কাউকে!'

'বিয়ে করলে এই জায়গায় পৌঁছাতে পারতাম?'

লিটন তাকাল। কোনও মেয়ের জীবনে কোন জায়গাটা বেশি কাম্য হওয়া উচিত, এ-ব্যাপারে সে মনস্থির করতে পারল না। স্বামীর সঙ্গে সুখের জীবন যাপন করা একজন হাউসওয়াইফ, স্বামীর সঙ্গে তিক্ততা নিয়ে বাস করা একজন হাউসওয়াইফ, সেই শূন্যতা থেকে অন্য পুরুষে আনন্দ খোঁজা হাউসওয়াইফ, চাকরি করা এবং স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে চলা অথবা অহনার মতো একা লড়াই করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো মহিলা, যার কাছে আত্মসম্মান বজায় রাখাই শেষ কথা। কোন জীবনটা?

লিটন বলল, 'মানুষ জন্মানো মাত্র মৃত্যুর দিকে ছোটে, এই তথ্য যদি ধরিস তাহলে তোর পথটাই বোধহয় ঠিক পথ। আসছি!'

'ও হো! খেয়ে যাবি না?'

'নারে! অফিসে যেতে হবে। হ্যাঁ, সোমবার থেকে একবার অন্তত অফিসে যাবি। আমি ঢাকায় যাচ্ছি।' লিটন বলল।

'কবে?'

'কাল রাত্রে।' লিটন চলে গেল।

দু'মিনিট বসে থাকল অহনা। তারপর কিচেনে ঢুকে ফ্রিজ খুলল। মাছ নেই। আলু আছে, পেঁয়াজ মাত্র দুটো। হঠাৎ এখন খুব ইচ্ছে করল অনেকরকম রান্না করতে। রান্নার নামে অনেক মেয়ের গায়ে জ্বর আসে। এখানে রান্নাঘর ছাড়া ফ্ল্যাটের চাহিদাও আছে। কিন্তু অহনার রাঁধতে খুব ভাল লাগে।

আলমারি খুলে টাকা বের করে সে গলা তুলে তৃণাকে ডাকতেই দেখল

মেয়ে চলে এসেছে। একটু অবাক হল অহনা। যাকে তিনবার না ডাকলে নড়ানো যায় না তার এই পরিবর্তনটা রীতিমতো অস্বস্তিকর।

'আমি জ্যাকসন হাইটে যাচ্ছি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরে আসব। তুমি কি এখন কিছু খাবে?' অহনা জিজ্ঞাসা করল।

'না। আমি যাব তোমার সঙ্গে।'

'গতকাল তো বই ছোঁওনি—।'

'সকালে এসে পড়েছি।'

'বেশ চল। ওখানে গিয়ে এটা কিনব ওটা কিনব বলে ঘ্যানঘ্যান করবে না।'

প্রথমে গাড়িটা গ্যারেজে নিয়ে গেল অহনা। গ্যারেজের ম্যানেজার সব শুনে নিজে থেকেই বিকল্প গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। সাতদিনের মধ্যে গাড়ি সারিয়ে দেওয়া হবে। ততদিন বিকল্প গাড়ির জন্যে ভাড়া দিতে হবে না। গাড়ির ইন্স্যুরেন্সের কাগজ দিয়ে সইসাবুদ করে মেয়েকে নিয়ে জ্যাকসন হাইটে চলে এল অহনা। এই মধ্য দুপুরেও জায়গাটা জমজমাট। পার্কিং-এর জায়গা পেতে কয়েকবার চক্কর মারতে হল। আগে একটা রাস্তায় দোকানগুলো ছিল, এখন পাশাপাশি তিনটে রাস্তার দু'দিকে বাংলাদেশি, ভারতীয় আর পাকিস্তানি দোকান। একটা সিনেমা হলে বেশির ভাগ সময় হিন্দি ছবি চলে, বাংলা মাঝে মাঝে। আজও অহনার মনে হল বাংলাদেশিরা ঝেঁটিয়ে চলে এসেছে কেনাকাটা করতে।

গাড়ি থেকে নেমেই তৃণা বলল, 'মা খিদে পেয়েছে।'

'এই যে বললি খাবি না?'

'এখন পাচ্ছে। চল না সেরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে লাঞ্চ খাই।'

অহনা মাথা নাড়ল। সেরার রান্না তারও ভাল লাগে। বাড়ি ফিরে রান্না শেষ করতে বিকেল হয়ে যাবে। এখান থেকে খেয়ে গেলে ঝামেলা থাকে না। অহনা বলল, 'আগে বাজার করব তারপর লাঞ্চ।'

তৃণার মুখ দেখে মনে হল কথাটা পছন্দ হয়নি তার।

দেশে যে ইলিশ দেখা যায় না এখানে তা পাওয়া যায়। চার পাউন্ড ওজনের ইলিশ দেখিয়ে লোকটা বলল, 'এ জিনিস আর পাবেন না। তিনদিন আগে পদ্মার পানিতে নাচতেছিল।'

'এত বড় মাছ নিয়ে কী করব। মাত্র দু'জন তো মানুষ।'

'কী কন ম্যাডাম! বন্ধুদের দাওয়াত দেন। তারা আপনার নাম করব। আঁশ ছাড়াইয়া দিই, বাসায় গিয়া কাটবেন।'

'দাম কত?'

'চব্বিশ টাকা দেন। ছয় টাকা পাউন্ড।'

বাংলাদেশে এখন এক ডলারের বিনিময় মূল্য সত্তর টাকা। এক পাউন্ড যদি পাঁচশো গ্রাম হয় তাহলে এক কেজির দাম সাতশো টাকা। বাংলাদেশে এখনও চার-পাঁচশো টাকায় ইলিশ পাওয়া যায়। তবে দু'কেজি মাছ সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।

বাজার করে ব্যাগ গাড়িতে রাখতে হল দু'-দু'বার। তারপর সেরা রেস্টুরেন্টের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে অহনার চোখে পড়ল শাকগুলো। ফুটপাতে কাঠের বাক্সের ওপর শাকের দোকান সাজিয়েছে যে-লোকটা সে নির্ঘাৎ চট্টগ্রামের। অনেকদিন পরে লাল শাক দেখে ইচ্ছে হল এক পাউন্ড কেনার।

'পাউন্ড কত?'

'খুব শস্তা ম্যাডাম। এমন লাল শাক আমেরিকায় পাবেন না। কত দেব?'

'দামটা বলুন।'

'ছয় ট্যাকা।'

'কী?' হকচকিয়ে গেল অহনা, 'বারো ডলার কেজি? ইলিশের সমান দাম? আপনি কি পাগল?'

লোকটা হাসল, 'এইটুকু আছে, কিছুক্ষণ পরে থাকবে না।'

'আটশো চল্লিশ টাকা লাল শাকের কেজি? ঢাকায় তো দশ টাকাও না।' অহনা বিড়বিড় করল।

'ঠিক কথা। তবে দশ টাকার সঙ্গে বিমানের ভাড়াটা যোগ করেন। বাংলাদেশ দশ ট্যাকা, এখানে বারো ট্যাকা। মাত্র দুই ট্যাকা বেশি। সোজা অঙ্ক।' লোকটা আর একজন খদ্দেরের দিকে তাকাল, 'কত?'

'দুই পাউন্ড দ্যান।' লোকটা বলল।

অহনা তৃণাকে নিয়ে হাঁটতে লাগল।

'ওটা কী শাক মা?'

'লাল শাক।'

'নিলে না কেন?'

'প্রচণ্ড দাম চাইছে লোকটা।'

'কোথায়? মাত্র সিক্স ডলার বলল।'

'ওটা রোজগার কর, তাহলে আর মাত্র বলবে না।'

'আচ্ছা মা, তোমরা ডলারকে টাকা বল কেন?'

না হেসে পারল না অহনা, 'আমরা বাঙালিরা ডলারটাকে টাকা হিসেবে ভাবতে খুব পছন্দ করি। বাংলাদেশের সত্তর টাকা মানে আমেরিকায় এক ডলার। ডলার না বলে টাকা বললে বোধহয় ফারাকটা বেশি মনে হয় না।'

তৃণা ব্যাখ্যাটায় যে সন্তুষ্ট হল না, তা তার মুখের অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি সবসময় কেন বল আমরা বাঙালি?'

'তো, কী বলব?'

'আমরা আমেরিকান সিটিজেন। পাসপোর্টে তাই লেখা আছে।'

'পাসপোর্টে যাই থাকুক, বাংলাভাষায় কথা বলি তাই বাঙালি।'

'না। তাহলে তোমার বলা উচিত আমরা বাংলাদেশি।'

'মানে?'

'কাল ড্যাডি বলেছে বাংলাদেশিদের ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা। এটা নাকি সারা পৃথিবী রিকগনাইজ করেছে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে নাকি কয়েকজন বাংলাদেশি শহিদ হয়েছিল তাই ওইদিন ইন্টারন্যাশন্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ডে হয়েছে।' বাবার বলা কথাগুলোকে উগরে দিল তৃণা।

রেস্টুরেন্টে ঢুকল অহনা। মেজাজটা খিঁচড়ে গিয়েছিল। ওর বাবা অর্ধসত্য কেন বোঝাবে মেয়েকে?

একটি সুন্দরী মেয়ে এগিয়ে এল, 'আসেন আপা। এই টেবিলে বসেন।' দেওয়াল ঘেঁষা একটা টেবিল দেখিয়ে দিল সে।

রেস্টুরেন্টটি অভিজাত, পরিচ্ছন্ন। কিচেন থেকে খাবারের গন্ধ ভেসে আসছে না। খুব নিচু ভল্যুমে শ্রীকান্তর গান বাজছে। চেয়ারে বসার পর খাবারের অর্ডার দিয়ে অহনা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত কী?'

তৃণা হেসে ফেলল, 'আমি জানি।'

'কার লেখা?'

'আর এন টেগোর।'

'ওঃ।' চোখ বন্ধ করল অহনা। 'ওঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উনি না জন্মালে

আমরা এখন মধ্যযুগে থাকতাম। ওঁর বাড়ি ছিল কলকাতায়। উনি তাহলে বাংলাদেশি নন। বাংলাভাষায় কথা বলে বাংলার মানুষ। সেই বাংলা ভাগ হয়ে হয়েছিল পূর্বপাকিস্তান আর পশ্চিমবঙ্গ। একাত্তরের স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তানের নাম হল বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গ ওই নামেই থেকে গেল। কিন্তু বাংলাভাষা দু'দেশের মানুষের ভাষা হয়ে থাকল। তোমার মাথায় কি কিছু ঢুকেছে?'

তৃণা গম্ভীর হয়ে অন্যদিকে তাকাল। অহনা বুঝতে পারল, সে বৃথাই বাক্য ব্যয় করল। এটা কী করে হচ্ছে? তার মেয়ে এরকম অকাট কেন হবে?

'এখন কেমন আছেন?'

চমকে মুখ তুলল অহনা। তৃণার ওপর তৈরি বিরক্তিটা চট করে ঝেড়ে ফেলতে না পারায় কথা বলতে পারল না।

'আমি অর্জুন দত্ত। বোধহয় চিনতে পারেননি।'

'ও, না, আই অ্যাম সরি। হ্যাঁ, এখন ভাল আছি।'

'এটি—?'

'আমার মেয়ে, তৃণা!'

'আচ্ছা! তুমি কেমন আছ ইয়ং লেডি?'

কাঁধ ঝাঁকাল তৃণা। যার মানে ঠিক আছি।

অহনা চাপা স্বরে বলল, 'উনি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছেন তার জবাব মুখে দেওয়াটাই উচিত।'

অর্জুন বললেন, 'আহা। এখন সারা পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা বডি ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলা পছন্দ করে। আমি আপনাদের বিরক্ত করছি না তো?'

'না না। আপত্তি না থাকলে আমাদের সঙ্গে বসতে পারেন।'

'বাঃ। আজ তাহলে এক কথা বলতে হবে না।' তৃণার পাশে বসলেন অর্জুন।

'মানে?' অহনা অবাক হল।

সেই সুন্দরী এসে দাঁড়িয়েছিল টেবিলের পাশে। অর্জুন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাদের এখানে আমি কী শর্তে লাঞ্চ করতে আসি?'

সুন্দরী হাসল, 'সাহেবের শর্ত হল ওঁর লাঞ্চের সময় আমাদের কাউকে ওঁর সঙ্গে গল্প করতে হবে। উনি একা চুপচাপ খাবেন না।'

অর্জুন হাসলেন, 'বুঝতেই পারছেন, মাঝে মাঝে একই কথা বলতে হয়। এখানে যারা আছে, তাদের বাড়ির সব খবর আমি জানি।'

সুন্দরী বলল, 'স্যার আজকে কি মৌরলা দেব?'

'হ্যাঁ। শুধু ডাল, আলুভর্তা আর মৌরলার ঝাল।'

সুন্দরী চলে গেলে অর্জুন তৃণাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি মৌরলা পছন্দ কর?'

'আমি জানি না। হোয়াটস দ্যাট? মুরগির মতো কিছু!'

'সর্বনাশ!' প্রায় আর্তনাদ করল অহনা।

হাসলেন অর্জুন, 'ওর দোষ নেই। মৌরলার নাম কখনও শোনেনি। তাই মুরগির কথা মনে পড়েছে। ওয়েল, তৃণা, এটা এক ধরনের মাছ। খুব নরম কাঁটা, কাঁটাসমেত খেতে হয়। এর টেস্ট মুরগির চেয়ে অনেক বেশি।'

'আমি কখনও খাইনি।'

'দেশে যাওনি কখনও?'

'একবার গিয়েছিলাম, ছোটবেলায়। খুব গরম।'

'কোথায় বাড়ি আপনার?' অহনাকে জিজ্ঞাসা করল অর্জুন।

'ঢাকায়।' অহনা তাকাল, 'আপনার?'

'কলকাতায়।'

অহনা মেয়ের দিকে তাকাল, 'উনি কলকাতার মানুষ। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গে, বাংলাদেশে নয়। আর উনি বাংলায় কথা বলছেন।'

'হুঁ।'

'বুঝতে পেরেছ?'

মাথা নাড়ল তৃণা। অর্জুন অবাক হলেন, 'কী ব্যাপার?'

তৃণা আপত্তি করল, 'না, বলবে না। আমি তো বুঝেছি।'

খাবার এসে গেল। অহনা বুঝতে পারল দু'জনের জন্যে যা বলে ফেলেছে, তাতে তিনজনের দিব্যি হয়ে যাবে। সে অর্জুনকে বলল, 'আপনি যদি শেয়ার করেন তাহলে ভাল হয়।'

'সরি। আমি খাওয়াটাকে উপভোগ করতে চাই। যদি বেশি হয়েছে বলে মনে করেন, ওদের বললে প্যাক করে দেবে।

অহনা একটু ভাবল। বাড়ি ফিরে সে রান্না করবে। এই খাবার বয়ে নিয়ে গেলে রান্নার ইচ্ছেটা চলে যেতে পারে।

অহনা চুপচাপ খেয়ে নিচ্ছিল। অর্ধেক খাওয়ার পরেই তৃণা মুখ এগিয়ে আনল, 'আমি একটা শেক খাব।'

'আগে সামনে যা আছে তা শেষ কর—!'

'উঁ! আমার পেট ভরে গেছে!' মুখ বেঁকাল তৃণা।

'পেট ভরে গেলে শেক খাবে কী করে? আশ্চর্য! তুমিই খিদে পেয়েছে বলে এখানে এলে, খেতে বসেই ইচ্ছেটা চলে গেল! এত হুইমজিক্যাল হলে চলবে?' অহনা বেশ বিরক্ত হয়ে বলল।

অর্জুন শুনছিলেন কিন্তু কিছু বললেন না।

খাওয়া শেষ হলে অহনা সুন্দরীকে ডেকে একটা আনারসের শেক দিতে বলল, ইচ্ছের বিরুদ্ধে। অর্জুন মাথা নাড়লেন, 'একটা না, তিনটে।'

অহনা মাথা নাড়ল, 'আমি ওটা খাব না।'

'ও। তাহলে দুটো।'

মহিলা চলে গেলে অর্জুন বললেন, 'আপনার বন্ধু মিস্টার লিটনের কাছ থেকে একটা ফোন আশা করেছিলাম। সমস্যার কি সমাধান হয়েছে?'

'কী সমস্যা?'

'আপনি গাড়ির কোম্পানিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন কিনা!'

'ও।' হাসল অহনা, 'না। আমি ক্ষতিপূরণ চাইছি না।'

'কিন্তু সেটা পাওয়ার সুযোগ ছিল।'

'জানি না। কিন্তু কাজটা অনৈতিক হত। অনেক মিথ্যে কথা বলতে হত। তা ছাড়া, সত্যি তো দুর্ঘটনার সময় আমি বেল্ট পরে ছিলাম না।'

মুখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অর্জুন বললেন, 'ধন্যবাদ।'

'মানে?'

'এখন কাউকে এরকম কথা বলতে শুনি না।'

দুটো মাঝারি গ্লাসে পাইনঅ্যাপল শেক এলে তৃণার মুখে হাসি ফুটল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের গ্লাসে চুমুক দিল সে।

অর্জুন তাকে বলল, 'তোমার খুব ভাল লাগে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল তৃণা।

'আমারও। এখানে এলেই এটা খেতে ইচ্ছে করে, ভয়ে খাই না।'

'কেন?' তৃণা তাকাল।

'ভয়ে। মোটা হওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই। আজ তোমার আবদারে খাচ্ছি।'

'থ্যাঙ্কস।'

বিল এল। অহনা হাত বাড়াচ্ছিল, আপত্তি করলেন অর্জুন, 'আপনি ওটা পে করতে চাইছেন?'

'অবশ্যই।'

অর্জুন হাসলেন, 'আমি যদি আপত্তি করি?'

'তাহলে বলব, এই টেবিলে এসে বসলেন কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে তৃণা বলে উঠল, 'টেক ইট ইজি আঙ্কল। কেউ একজন দিয়ে দিলেই তো হল।'

'ওয়েল!' তৃণার দিকে তাকিয়ে বললেন অর্জুন। পেমেন্ট করে দিয়ে বাইরে এসে অহনা বলল, 'মেয়েরা পে করতে চাইলে পুরুষদের ইগোতে লাগে কেন বলুন তো?'

'আমার লেগেছে বলে মনে হচ্ছে?'

'আপনি আপত্তি জানাতে চাইছিলেন।'

'চাইনি। জিজ্ঞাসা করেছি। ভালই তো, আপনি আমাকে লাঞ্চে খাওয়ালেন। গাড়ির ক্ষতিটা আর তেমন মনে লাগছে না।' তৃণার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন অর্জুন, 'ইয়েস ইয়ং লেডি! তুমি কি চাও আমাদের আবার দেখা হোক?'

তৃণা হাসল, 'শিওর!'

হাত বাড়িয়ে তৃণার সঙ্গে হাত মিলিয়ে অর্জুন বললেন, 'আমাকে এক্ষুনি ছুটতে হবে। একদম ভুলে গিয়েছিলাম। মেয়েটিকে নিয়ে আসার কথা।'

'মেয়েটি—!' অহনা অন্যমনস্ক ভাবে বলল।

'এখন বলতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। ইচ্ছে হলে রাত আটটার পরে ফোন করবেন। বলব।' পকেট থেকে পার্স বের করে একটা কার্ড তুলতে গিয়ে মনে পড়ে যাওয়ায় বললেন, 'আপনার কাছে তো আমার কার্ড আছে। আচ্ছা, চলি।'

বড়বড় পা ফেলে ফুটপাতের ভিড়ে মিলিয়ে গেলেন অর্জুন। অহনার মনে হল, ভদ্রলোক যেন আচমকা তড়িঘড়ি করে বিদায় নিলেন। লাঞ্চের দাম ওকে দিতে দেওয়া হয়নি বলে কি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন? হলে কিছু করার নেই। পুরুষরা চিরকাল কর্তৃত্ব করবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। তাতে যদি কারও ইগোয় আঘাত লাগে, তাহলে সেটা তার সমস্যা।

রাত আটটা নাগাদ স্নান করতে গেল অহনা। প্রায় গোটা সপ্তাহের রান্না শেষ করে ফেলেছে সে। শুধু ভাতটা বাদে। ওটা খাওয়ার আগে গরম গরম না

বানালে ভাল লাগে না। সেই যে তৃণা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে, আর তার দেখা নেই। বাথরুমের শাওয়ার কার্টেন টেনে স্নান করতে করতে মনে হল ফোন বাজছে। এই অবস্থায় বেরিয়ে ফোন ধরা যায় না। ওটা এখন বেজে যাবে। তৃণার কানে ওই শব্দ কিছুতেই ঢুকবে না।

শুধু তৃণা কেন, ওদের বয়সি ছেলেমেয়েদের অনেকেই বড় হচ্ছে একই ধারায়। মাঝে মাঝে মনে হত, এই যে সে দেশ থেকে, আত্মীয়স্বজনদের থেকে আলাদা হয়ে একা থাকতে বাধ্য হয়েছে এবং তৃণার কোনও সমবয়সি সঙ্গী নেই, দাদু-দিদা কাকা-জ্যেঠা নেই তাই সে নিজের চারপাশে একটা খোলস তৈরি করে অপারিবারিক হয়ে বড় হচ্ছে। নিজের স্বার্থ কীসে ভাল হবে, তা না জেনেই স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে। হয়তো ওর বাবা বাড়িতে থাকলে এরকম আলাদা জগৎ তৈরি করে নিয়ে বড় হত না। কিন্তু বাবা-মায়ের কাছে বড় হওয়া ছেলেমেয়েরাও তো একই আচরণ করছে। বাড়ি ওদের কাছে যেন জেলখানা, স্কুলের বন্ধুরাই প্রিয়জন। তৃণা এই বয়সে মধ্যরাতে নেটে ব্লু-ফিল্ম দেখছে অথচ তার পক্ষে ওকে বকাঝকা করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ সেটা করে বিন্দুমাত্র লাভ হবে না। না তার না তৃণার। এখন এই মুহূর্তে ঘরের দরজা বন্ধ করে তৃণা যে কী করছে তাও তার জানা নেই। অথচ সেই ছয়মাস বয়স থেকে মেয়েটাকে নিয়ে—!

আঠারো হলে তৃণার স্বাধীনতা থাকবে সে কোথায় থাকতে চায়, তা ঠিক করার। আঠারোর পরে এদেশের ভাল ছেলেমেয়েরা কলেজে চলে যায়। সেই যে যায়, আর বাড়ির সঙ্গে তেমন সংযোগ থাকে না। তৃণা যদি আঠারোয় পা দিয়ে বলে, সে বাবার সঙ্গে থাকবে তাহলে অহনাকে সেটা মেনে নিতে হবে। ছয়মাস বয়সের তৃণাকে বাঁচাবার জন্যে এতদিন ধরে সে যা করেছে তা নেহাতই ভুল বলে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। তৃণার আঠারোয় পৌঁছতে আর কী এমন দেরি!

নিউজার্সির ক্লোস্টার শহরে অর্জুন দত্ত আছেন প্রায় এগারো বছর। এসেছিলেন খড়্গপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে। চাকরি পেয়েছিলেন দেশে বসেই। ভাল মাইনে। সকাল সাতটায় বেরিয়ে সন্ধে সাতটায় বাড়ি ফেরা। প্রথমে উঠেছিলেন এক বন্ধুর দাদার বাড়িতে। তারপর ব্রুকলিনের এক-কামরার ফ্ল্যাটে। সেখান থেকে নিউজার্সির এই বাড়িতে। বাড়িওয়ালি

মহিলাটি বলেছিলেন, 'তুমি যুবক, একা। তবু তোমাকে আমার এই বাড়িটা ভাড়া দিচ্ছি দুটো শর্তে। এক, এই বাড়িটাকে নিজের বাড়ি মনে করে যত্ন নেবে। দুই, তোমার প্রেমিকা ছাড়া অন্য কোনও মেয়েকে বাড়িতে আনবে না। সেই সঙ্গে শুক্রবার বা শনিবারে এমন কোনও পার্টি দেবে না, যার আওয়াজ শুনে প্রতিবেশীরা বিরক্ত হবে।'

কথা দিয়েছিলেন অর্জুন। ওপরে দুটো বেডরুম, নীচে হলঘর, বসার ঘর ছাড়া কিচেন টয়লেট আছেই। আছে পাশে একটা খোলা জায়গা যেখানে গাড়ি রাখা যায়। এরকম একটা বাড়ির ভাড়া হাডসনের ওপারে নিউইয়র্কে আড়াই হাজার ডলারের নীচে হত না। কিন্তু ভদ্রমহিলা বললেন, 'জল, ইলেকট্রিক, গ্যাস তোমার। আমাকে মাসে নয়শো দিয়ো।' অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'নয়শো কেন? হাজার বললেন না কেন?' ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, 'বলব। তোমার ব্যবহার দেখে খারাপ লাগলে প্রথমে হাজার চাইব, তারপরও যদি ওইরকম চলে তাহলে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলব।'

এগারো বছর চলে গেছে, ভদ্রমহিলা এক সেন্টও ভাড়া বাড়াননি। অর্জুন একবার নিজেই বলেছিলেন ভাড়া বাড়ানোর কথা। ভদ্রমহিলার বয়স বাড়লেও কথাবার্তা একই ধরনের রয়ে গেছে। বলেছিলেন, 'তুমি তো আমার শর্ত ভাঙনি, তবে আমার খুব খারাপ লাগে এই ভেবে যে, তোমার কোনও প্রেমিকা জোটেনি।'

অর্জুন মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ভাড়ার কথা বলতে এসেছেন। ভদ্রমহিলা মাথা দুলিয়েছিলেন, 'ডাটা, ওই বাড়িটা দেখাশোনা করার জন্য যদি একজন কেয়ারটেকার রাখতে হত তাহলে তাকে খুব কম করে দেড় হাজার ডলার মাসে দিতে হত। তুমি থাকায় সেই ডলার বেঁচে যাচ্ছে। আমার যা আছে তাতে বাকি দিনগুলো দিব্যি চলে যাবে। একশো ডলার ভাড়া বাড়িয়ে তো আমি বাড়তি কোনও আনন্দ পাব না।'

এদেশে এসে কয়েক বছর চাকরির পর একটু ধাতস্থ হয়ে বেশির ভাগ বাঙালি পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে শোধ করার অঙ্গীকারে বাড়ি গাড়ি ইত্যাদি কিনে ফেলেন। মাইনের টাকার অর্ধেকটাই প্রতিমাসে ধার শোধ করতে চলে যায়। তারপর খাওয়া, ঘর সাজানো ও অন্যান্য খরচ মিটিয়ে সামান্যই পড়ে থাকে ব্যাঙ্কে। তবু তাঁরা বেশ আনন্দে থাকেন এই ভেবে যে, বাড়িটার মালিক তিনি।

নিউজার্সির বাঙালিদের সঙ্গে অর্জুনের পরিচয় দুর্গাপুজোর সময়ে। মণ্ডপে গেলে একজন থেকে আর একজনের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। অর্জুনের অফিসের সহকর্মী মৃণাল বসু তাকে নিয়ে গিয়েছিল ওখানে। বিশ্বনাথ গুপ্ত বললেন, 'দূর মশাই, আপনি একজন বাঙালি, ক্রোস্টারে থাকছেন আটমাস আর আমরা কিছুই জানি না? আজ আপনার সঙ্গে সবার আলাপ হয়ে গেলে দেখবেন শুক্র এবং শনিবার সন্ধ্যায় আপনি আর বোর হচ্ছেন না। নেমন্তন্ন আর নেমন্তন্ন।'

প্রথম প্রথম সেইসব নেমন্তন্নে গিয়েছিলেন অর্জুন। তারপর যাওয়া বন্ধ করলেন। প্রতিটি বাড়িতে একই লোকজন, একই বিষয় নিয়ে কথাবার্তা, একই ধরনের খাওয়া অথচ কেউ বিরক্ত হচ্ছেন না, কারও একঘেয়েমি লাগছে না। ওরকম এক পার্টিতে বিশ্বনাথ গুপ্ত বললেন, 'সে কী হে! তুমি ভাড়া দিয়ে আছ কেন? কত ভাড়া দিচ্ছ?'

'নয়শো।'

'আরে প্রায় ওই টাকা মাসে ইএমআই দিলে তিরিশ বছর পরে নিজের বাড়ির মালিক হয়ে যাবে তুমি। চাও তো কালই আমি যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি।'

অর্জুন হেসেছিলেন, 'কিন্তু দাদা, ছ'মাস পরে যদি চাকরিটা চলে যায়—!'

'তোমার বিরুদ্ধে কোম্পানি যদি কোনও বিশেষ অভিযোগ না করতে পারে তাহলে এদেশে চাকরির অভাব হবে না। এরা তো বেশির ভাগই অশিক্ষিত।'

'তবু মাথার ওপর একটি সাদাকে বসিয়ে রাখে। তা ছাড়া তিরিশ বছর ধরে ধার শোধ করার কোনও বাসনা আমার নেই।'

'নেই? তুমি বিয়ে করবে না? সংসার—!'

'ও নিয়ে কিছু ভাবিনি। কিন্তু ধার নিয়ে আনন্দে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ওই এক ঘরের ফ্ল্যাটেই থাকতে চাও?'

'এক নয়। বাড়িটা দোতলা এবং সবক'টা ঘর আমার কাজে আসে না।'

'সে কী? ক'টা ঘর?'

'তিনটে প্লাস একটা বড় হল।'

'মাই গড! তুমি ন'শো টাকায় কী করে পেলে! ভাবা যায় না। ঠিক আছে। সামনের মাসে এক শুক্রবারে বাড়িতে পার্টি দাও। হাউস ওয়ার্মিং বলে তো

একটা কথা আছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা কোরো না। তোমার বউদি সব ব্যবস্থা করে দেবে। কাকে কাকে বলবে তা আমি তোমাকে বলে দেব।'

তখনই কিছু বলেননি, কিন্তু পরে এড়িয়ে গিয়েছিলেন অর্জুন। নিজেও যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। নেমন্তন্ন পেলেই কাজের অজুহাত দেখাতেন। সবাই বুঝে গিয়েছিল অর্জুন দত্ত একজন অসামাজিক মানুষ।

অর্জুনের একদা সহকর্মী মৃণাল বসু একটু অন্যরকম ছেলে। সমমনস্ক কিছু মানুষ নিয়ে ওরা নাটকের দল তৈরি করেছে। মনোজ মিত্র, মোহিত চ্যাটার্জির নাটক পুজোর সময় করত। এখন তিনমাস অন্তর হল ভাড়া নিয়ে শো করে। অর্জুন গিয়েছিলেন দেখতে। কলকাতায় গ্রুপ থিয়েটার করা ছেলে মৃণালের প্রোডাকশন বেশ ভাল, কিন্তু দর্শকের সংখ্যা পঁচিশ তিরিশের বেশি নয়। যেখানে বেশির ভাগ মানুষ সোম থেকে বৃহস্পতি অফিসের পর আর বাড়ি থেকে বের হয় না পরের দিন অফিসে যেতে দেরি হয়ে যাওয়ার ভয়ে, সেখানে মৃণালরা সপ্তাহে তিনদিন রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত রিহার্সাল দেয়। শনিবারে বিকেল থেকে। ওদের এইসব কাজকর্ম দেখে বেশ বিরক্ত গরিষ্ঠ বাঙালিরা। একজন বলেই ফেললেন, 'আমেরিকায় এসে যদি চটি পায়ে বাংলা নাটক করবি তাহলে এলি কেন? দেশে থেকে করতে পারতিস। আমেরিকায় এসে পাতি বাঙালি হয়ে থাকার কী দরকার?'

অর্জুন আরও সরে গিয়েছিলেন। মৃণালকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনারা এত কষ্ট করে অভিনয় করছেন অথচ দর্শক হচ্ছে না। তার ফলে যা খরচ করছেন তা উঠছে না। এরকম কতদিন করা সম্ভব?'

'যতদিন উৎসাহ থাকবে, ভাল লাগা থাকবে। যারা পুজোর সময় বেশি পয়সায় আমাদের নাটক দেখে হাততালি দেন তারা পাঁচ ডলারের টিকিট কেটে হলে আসেন না। কারণ সেটা তাদের কাছে দু'শো পঁচিশ টাকা হয়ে যায়। অথচ দেশ থেকে যদি সিনেমা বা সিরিয়ালের বি-গ্রেডের অভিনেতা অভিনেত্রীদের দিয়ে বস্তাপচা নাটক কোনও রকমে খাড়া করিয়ে এখানে আনা যায় তাহলে পঁচিশ পঞ্চাশ ডলারের টিকিট কিনতে এদের এক মুহূর্ত দেরি হয় না। আমরা ঘর কা মুরগি, তাই ডাল বরাবর।'

'তাহলে?'

'আশায় আছি। আগে দশ পনেরো জন আসত, এখন পঁচিশ তিরিশ হচ্ছে। যদি আরও বাড়ে!'

'তুমি কলকাতায় থেকে গেলে না কেন?'

'ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এই চাকরি না পেলে নিশ্চয়ই থেকে যেতাম। রেজাল্টটা ভাল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সবাই আমার দিকে যে-আশা নিয়ে তাকাল তা কলকাতায় চাকরি করে মেটানো সম্ভব ছিল না। এখানকার দু'শো টাকা কলকাতায় পৌঁছালে নয় হাজার টাকা হয়ে যায়। পাঁচ জায়গায় পাঠাতে হয় আমাকে। কলকাতায় সেটা কল্পনা করতে পারতাম না।'

'নিজের কথা ভাবছ না?'

'নিশ্চয়ই। আমি মাইনে পেলেই ভাবি যা পেলাম তা থেকে এক হাজার কমে গেছে। বাকিটায় ভাল ভাবে থাকতে হবে। তাই আছি। আপনি তো সুতপাকে আমাদের সঙ্গে অভিনয় করতে দেখেছেন। আমরা খুব শিগগির বিয়ে করছি। ওকেও দেশে পাঁচশো ডলার পাঠাতে হয়। এটা পাঠিয়ে যাব আমরা। তার পরেও বাড়ি ভাড়া করে চমৎকার চলে যাবে।'

'বাড়ি কিনবে না?'

'নাঃ। টাকা জমিয়ে বছর কুড়ি পরে দেশে ফিরে যাব।' মৃণালের যেন হঠাৎ খেয়াল হল, 'আপনার প্ল্যান কী?'

'ভাবছি। ভেবে শেষ করতে পারিনি।' অর্জুন হেসেছিলেন।

বছর খানেক বাদে মৃণাল এক রাত্রে ফোন করল, 'খুব ব্যস্ত?'

'বিন্দুমাত্র নয়।'

'একটা ঘটনা ঘটেছে। আপনার সাহায্য চাই।'

'যেমন?'

'দেশের এক বন্ধুর ফোন পেয়েছিলাম কয়েক দিন আগে। ওর বোনের বিয়ে হয়েছিল অ্যাস্টোরিয়াতে থাকা বাঙালি ডাক্তারের সঙ্গে। বেশ ধুমধাম করে। বিয়ের পর বর ফিরে এসেছিল। কাগজপত্র জোগাড় করে ওরা এক বছর পরে বোনকে পাঠাতে পেরেছিল এদেশে, স্বামীর ঘর করতে। কেনেডি এয়ারপোর্টে নেমে মেয়েটি ফোনে পৌঁছ সংবাদ দিয়েছিল। তারপর থেকে ওরা মেয়েটির খবর পাচ্ছিল না। ফোনেও না, চিঠিতেও না। ডাক্তারের বাড়ির ফোন নাম্বারও নাকি বদলে গেছে। বন্ধু আমাকে অনুরোধ করেছিল খোঁজ নিতে। যে-ঠিকানা দিয়েছিল সেখানে গিয়ে দেখলাম একজন স্প্যানিশ মহিলা দরজা খুলল। তিনি নিজেকে ডাক্তারের স্ত্রী হিসেবে দাবি করলেন। একটা বছর দুয়েকের বাচ্চাও আছে তাঁর। বললেন, 'কোনও বাঙালি মহিলা কখনও ওই বাড়িতে আসেনি।'

'সেকী?' চমকে উঠলেন অর্জুন, 'তোমার পুলিশে ইনফর্ম করা উচিত।'

'করেছিলাম। পুলিশ বাড়ি সার্চ করে শেষ পর্যন্ত বেসমেন্ট থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। বীভৎস চেহারা হয়ে গেছে ওর। চুল কেটে স্কার্ট পরিয়ে রেখেছিল। এই কয়েক মাস বেসমেন্ট থেকে ওপরে উঠতে দেওয়া হয়নি ওকে। বাচ্চাটাকে ওর কাছে রেখে ওরা তালা দিয়ে অফিসে যেত। পুলিশ স্প্যানিশ মহিলাকে অ্যারেস্ট করেছে। ডাক্তার এখনও ফেরেনি। ফিরলেই পুলিশ ধরবে।' মৃণাল বলেছিল।

'গুড। শাস্তি হওয়া উচিত লোকটার।'

'ঠিক, কিন্তু কীভাবে?'

'মানে?'

'সীমা, মানে ওই মেয়েটিকে পুলিশ ছেড়ে দিচ্ছে। ওর পাসপোর্ট ওই বাড়ি থেকেই পাওয়া গেছে। যেহেতু ভিসা আছে তাই কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু মামলা চালানোর জন্যে ওকে এখানেই থাকতে হবে। প্রশ্ন হল, কোথায় থাকবে?' মৃণাল বলল।

একটু ভাবলেন অর্জুন, 'ওঁর আর কোনও আত্মীয় এখানে নেই?'

'না। ওর দাদাকে ফোন করেছিলাম। ওরা চাইছে ছাড়া পাওয়া মাত্র ও প্লেনে উঠে পড়ুক। চলে গেলে মামলা ঝুলে যাবে। তা ছাড়া সীমাও যেতে চাইছে না।'

'কেন?'

'এই অবস্থায় দেশে ফিরে গেলে বাড়ির বোঝা হয়ে যাবে বলে ভাবছে।'

'তাহলে—! বিশ্বনাথবাবুকে বললে হয় না? বাঙালি সংগঠনগুলো থেকে যদি সাহায্য করে—!'

'অসম্ভব। অনেক উলটোপালটা কথা শোনাবে। আচ্ছা আপনার বাড়িতে তো বাড়তি ঘর আছে। কয়েকটা দিন আপনার ওখানে রাখা যাবে?'

একটা মেয়েকে প্রায় কোনও খোঁজখবর না নিয়ে কলকাতায় বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘর করতে পাঠানো হয়েছিল নিউইয়র্কে। লোকটা হয়তো তার বাবা-মা-কে সন্তুষ্ট করার জন্যেই বিয়েটা করেছিল আর ভেবেছিল, বিনা পয়সায় বাচ্চার জন্যে একটা বেবিসিটার পাওয়া গেল। কিন্তু মেয়েটা কী দোষ করেছিল? এরকম অবস্থায় ওর পাশে দাঁড়ানো উচিত। কিন্তু—।

উত্তর না পেয়ে মৃণাল বলল, 'আমার তো একখানা ঘর। এখানে নিয়ে এলে

আমাকেই উদ্বাস্তু হতে হয়। একসঙ্গে থাকলে সুতপা সহ্য করতে পারবে না।'

'কখন বলতে হবে?'

'কাল সকালের মধ্যে।'

'কাল তো শনিবার।'

'স্পেশাল কোর্ট খোলা আছে।'

'ঠিক আছে।' ফোন রেখে দিয়ে খানিকক্ষণ ভাবলেন অর্জুন।

এখন রাত ন'টা। এই সময় প্রৌঢ়াকে ফোন করা ঠিক হবে? কিন্তু ওঁকে তো জানাতেই হবে। ভাড়া দেওয়ার সময় উনি শর্ত দিয়েছিলেন, প্রেমিকা ছাড়া অন্য কোনও মেয়েকে এই বাড়িতে নিয়ে আসা চলবে না। শেষ পর্যন্ত নাম্বার ঘোরালেন অর্জুন।

ভদ্রমহিলার গলা পেয়ে নিজের পরিচয় দিলেন।

'ওঃ, ডাটা, খুব সমস্যায় পড়েছ বলে মনে হচ্ছে, না হলে এই সময় তুমি আমাকে ফোন করতে না। আমার ডিনার হয়ে গেছে কিন্তু এখনও বিছানায় যাইনি।'

'আমি যদি আপনার কাছে গিয়ে বলতে পারতাম তাহলে ভাল হত। আসলে কাল সকালেই আমাকে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।'

'তোমার ওখান থেকে আসতে অন্তত আধ ঘণ্টা লাগবে। তুমি টেলিফোনেই বলো।'

অগত্যা মৃণালের মুখে শোনা ব্যাপারটা সরাসরি বললেন অর্জুন। সব শুনে ভদ্রমহিলা বললেন, 'এই মেয়েটিকে ব্যক্তিগতভাবে চেনো?'

'না। তবে আমার সহকর্মী চেনেন।'

'কাল কখন জানাতে হবে?'

'সকালে। কারণ স্পেশাল কোর্টে কেস উঠবে। তারপরই বোধহয় মেয়েটাকে পুলিশ ছেড়ে দেবে।'

'হুঁ। তুমি তোমার সহকর্মীর কাছ থেকে জেনে নাও স্পেশাল কোর্টটা কোথায় এবং কখন কেসটা উঠবে। কাল সকালে আমাকে জানিয়ে দিয়ো।' লাইন কেটে গেল।

মিসেস ম্যাকফারসন হ্যাঁ বা না বললেন না। অর্জুনের অনুমান ছিল এই ভদ্রমহিলা বেশ গোঁড়া। এখন সেটা আরও বেশি মনে হল।

সকালে তিনি ফোন করার আগেই মৃণালের ফোন এল, 'কী ভাবছেন?'

'স্পেশাল কোর্ট কোথায়? কখন কেসটা উঠবে?'

মৃণাল ঠিকানাটা বলল, উঠবে সকাল সাড়ে দশটায়।

অর্জুন বললেন, 'তার আগেই তুমি জানতে পারবে?

মৃণালও জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সাহস পাচ্ছেন না?'

অর্জুন বললেন, 'ল্যান্ডলেডির অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করছি।'

মিসেস ম্যাকফারসনকে জানাতে তিনি বললেন, 'এখান থেকে অ্যাস্টোরিয়াতে পৌঁছাতে অন্তত এক ঘণ্টা লাগবে। যদিও শনিবার বলে আজ ট্রাফিক কম। তুমি কি অনুগ্রহ করে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে? আমি ন'টা পঁচিশেই তৈরি হয়ে থাকব।'

'অবশ্যই।'

অর্জুনের আশা হল। ভদ্রমহিলা যখন নিজে যেতে চাইছেন তখন স্বচক্ষে দেখে তবে অনুমতি দেবেন। প্রৌঢ়া অন্যের কথায় বিশ্বাস করেন না।

মিসেস ম্যাকফারসন তৈরি ছিলেন। তাঁকে নিয়ে হাডসন পেরিয়ে অ্যাস্টোরিয়াতে পৌঁছাতে ঠিক এক ঘণ্টা দশ মিনিট লেগে গেল। গাড়ি পার্ক করে বিরাট বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে অর্জুন যখন ধন্দে, তখন মৃণাল দৌড়ে এল, 'আসুন।'

মৃণালের সঙ্গে মিসেস ম্যাকফারসনের পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি যখন মেয়েটিকে চিনতে, শুনলাম তোমার বন্ধুর বোন, তাহলে তুমি নিজের কাছে ওকে রাখতে চাইছ না কেন?'

মৃণাল বলল, 'আমি ওয়ান রুম ফ্ল্যাটে থাকি। ও থাকলে অনেকেই ভুল বুঝবে।'

'তাই বল।'

কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর কোর্ট সীমাকে ছেড়ে দিল। অবশ্য তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নিউইয়র্কে তার থাকার জায়গা আছে কিনা। না হলে সরকারি হোমে তাকে পাঠানো যেতে পারে। সরকারি উকিল বলল, 'তার দরকার নেই। ওর দাদার বন্ধু এই শহরে আছেন যাঁর সাহায্যে ওঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।'

স্প্যানিশ মহিলাকে সন্তানসহ জেলে যেতে হল। তিনি জামিন পেলেন না।

অর্জুন মেয়েটিকে দেখলেন। ফর্সা, সুন্দর চেহারা। কিন্তু পরনে ময়লা স্কার্ট, চুল বিশ্রীভাবে ছাঁটা। ফলে সৌন্দর্য চাপা পড়ে গেছে।

ওদের সামনে এসে সীমা কেঁদে ফেলল। দু'হাতে মুখ ঢাকল।

মৃণাল বলল, 'শক্ত হ। আর তোর কোনও চিন্তা নেই। আমরা আছি।'

'আমি দেশে ফিরে যাব না।' হাত সরাল না সীমা।

'কেন?'

'এই মুখ নিয়ে আমি ওখানে কিছুতেই যাব না।'

মিসেস ম্যাকফারসন বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কী বলল?'

অর্জুন ঠিকঠাক অনুবাদ করে দিল।

মৃণাল প্রথমে অর্জুনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। অর্জুন বললেন, 'তোমার মন শক্ত করো। তুমি তো এখানে থাকতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'ইংরেজি বোঝ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ইংরেজি বলছি। তুমি কেন এদেশে থাকতে চাও?'

'যে-লোকটা আমাকে ঠকিয়েছে, তার শাস্তি দেখতে চাই। তার পর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবেই দেশে যাব।' ইংরেজিতে বলল সীমা।

'গুড। ভেরি গুড। ডাটা। যদিও ও তোমার প্রেমিকা নয় তবু ও তোমার কাছে থাকতেই পারে। তবে কখনও যদি কেউ তোমার প্রেমিকা হয় এবং তোমার বাড়িতে আসে তাহলে সে এতটা বুঝবে না। আমি একটা প্রস্তাব দিতে পারি। ওর মানসিকতা আমার পছন্দ হয়েছে। ও যদি আমার বাড়িতে একটা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত থাকে, তাহলে তোমাদের কি আপত্তি আছে?'

অর্জুন কিছু বলার আগেই সীমার মুখে হাসি ফুটল, 'আমি কী বলে আমার কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানাব? এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে!'

মৃণালও ধন্যবাদ জানাল মিসেস ম্যাকফারসনকে। তিনি বললেন, 'কাল রাত্রে ডাটা যখন টেলিফোনে ব্যাপারটা বলল তখন হঠাৎ মনে হয়েছিল আমি যদি ইন্ডিয়াতে থাকতাম আর আমার মেয়ের নিউইয়র্কে এই অবস্থা হত তাহলে কেমন লাগত। লুক। আমার কোনও ছেলেমেয়ে নেই। আমার স্বামী মারা গিয়েছেন। একা থাকতে কতক্ষণ ভাল লাগে। তাই আমারও স্বার্থ আছে।'

মৃণাল জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী রকম?'

'আমার ইন্ডিয়ান কারি খেতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে

এত মশলা দেয় যে, খেতে ভয় হয়। সীমা নিশ্চয়ই কম মশলা দিয়ে আমার জন্যে কারি রেঁধে দেবে। তাই তো?'

সীমা ঘাড় নেড়েছিল।

মৃণালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা থানায় গিয়েছিল। সেখান থেকে সীমার দুটো স্যুটকেস, যেগুলো ডাক্তারের বাড়ি থেকে পুলিশ উদ্ধার করে এনেছিল, তা সংগ্রহ করে অর্জুন ওঁদের মিসেস ম্যাকফারসনের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল।

নামবার আগে মিসেস ম্যাকফারসন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমি লক্ষ করেছি, আমার সিদ্ধান্ত শোনার পর থেকে তুমি একটা কথাও বলনি। কেন?'

'আপনি আমার সব কথা কেড়ে নিয়েছেন।' অর্জুন হেসেছিলেন।

'এই বয়সেও কারও স্তুতি শুনলে দেখছি খারাপ লাগে না।'

ডাক্তার ধরা পড়েছিল। ভদ্রলোকের আট বছর জেল হয়েছে। সেই স্প্যানিশ মহিলাকে তিন বছরের জন্যে জেলে পাঠানো হয়েছে। বাচ্চাটাকে সরকারি শিশুনিবাসে রাখা হয়েছে। অর্জুন কখনওই মিসেস ম্যাকফারসনের বাড়িতে যেতেন না। টেলিফোনেও কথা কম হত। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে প্রৌঢ়া তাঁকে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন।

সেটাও ছিল শুক্রবার। 'ইন্ডিয়া অ্যাব্রড' কাগজটা সামনে রেখে মিসেস ম্যাকফারসন বললেন, 'এটা বন্ধ করা দরকার।'

অর্জুন খবরটা পড়লেন। একটি ভারতীয় মেয়েকে পুলিশ ম্যানহাটনের পোর্ট অথরিটি থেকে ধরেছে। মেয়েটি ইংরেজি জানে না। পাসপোর্ট সঙ্গে নেই। একজন ভারতীয়কে দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ জেনেছে যে মাত্র পনেরো দিন আগে সে স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে এদেশে এসেছিল। তার স্বামীই তাকে নিয়ে আসে। যে-বাড়িতে তাকে তোলে সেখানে তাকে পরিচারিকার কাজ করতে বাধ্য করা হয়। না করতে চাইলে এক মহিলা তাকে খুব মারতেন। সেদিন সে বাড়ি থেকে পালায়। একটা লোক তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে বাসে করে পোর্ট অথরিটিতে নিয়ে আসে। লোকটার ভাবগতিক দেখে মেয়েটির সন্দেহ হওয়াতে চিৎকার করে ওঠে। পুলিশ আসতে দেখে লোকটা পালিয়ে যায়। কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই তার স্বামীর ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বার বলতে পারছে না। ভারতে তার বাড়ি যে গ্রামে সেখানে

টেলিফোন নেই। মেয়েটির বলা ভারতীয় ঠিকানায় খবর নেওয়ার জন্যে ইন্ডিয়ান হাই কমিশনারকে অনুরোধ করা হয়েছে।'

উত্তেজিত মিসেস ম্যাকফারসন জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের দেশ থেকে আসা পুরুষগুলো কি জানোয়ার? তারা বিয়ে করে বেবিসিটার অথবা মেড সার্ভেন্ট নিয়ে আসার জন্যে? এটা কি বন্ধ করা যায় না?'

অর্জুন মাথা নেড়েছিলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই মানবেন, আমাদের দেশ থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সবাই জানোয়ার নয়। এই যে আমি আপনার সামনে বসে আছি, আমি যদি জানোয়ার হতাম তাহলে আপনি বসতে দিতেন না।'

'না না, আই অ্যাম সরি, আমি ওভাবে বলতে চাইনি।'

'আমি বুঝেছি।' অর্জুন ওঁকে থামিয়ে দিলেন, 'প্রচুর মেয়ে দেশ থেকে বিয়ের পর এখানে এসে সুন্দর সুস্থ জীবনযাপন করছেন। নিউজার্সির যে-কোনও বাঙালিদের উৎসবে গেলেই আপনি তাঁদের দেখতে পাবেন। এই সব মহিলারা পড়াশুনা করে যে-জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছেন তা এদেশের অনেকেই পারেননি। ব্যতিক্রম তো আছেই। সব আমেরিকান মহিলার হৃদয় কি আপনার মতো? কিন্তু কে বিয়ের পর বউকে নিয়ে এসে এই অন্যায় করবে, তা তো আগে জানা যায় না।'

'কেন? ছেলেটা সম্পর্কে খোঁজ না নিয়ে বিয়ে দেয় কেন?'

'হাজার হাজার মাইল দূর থেকে ক'টা খবর নেওয়া সম্ভব? আর খবর নিলেও যারা বাইরে থেকে দেখবে তাদের পক্ষে ভেতরে ভেতরে কী হচ্ছে তা কি জানা সম্ভব? কেউ হয়তো অফিসে ভদ্র, বন্ধুদের কাছে ভদ্র কিন্তু বাড়িতে তার আর এক চেহারা।'

মিসেস ম্যাকফারসন বললেন, 'এই যে সীমা, কী চমৎকার মেয়ে। বাড়িতে বসে নেই। এর মধ্যে সে ম্যাকডোনাল্ডে চাকরি পেয়ে গেছে। কাজে যাওয়ার আগে এবং ফিরে এসে এবাড়ির সব কাজ নিজের হাত করে। আমি বললেও শোনে না। আমার তো এর পরে হাতে পায়ে বাত ধরে যাবে। দেশে ও এম এ পাশ করেছিল। ওর ইচ্ছে এখানে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়ার। আমি চেষ্টা করছি সামনের সেমিস্টারে ওকে ভরর্তি করতে।'

'বাঃ।' খুব ভাল লাগে অর্জুনের।

'আমি একটা কথা ভাবছি ডাটা।'

'বলুন।'

'আমরা যদি একটা সংস্থা তৈরি করি এই সব বিপদে পড়া মেয়েদের সাহায্য করার জন্যে? রোগ হওয়ার উৎসটা যখন বন্ধ করা সম্ভব নয়, রোগটা সারাবার চেষ্টা তো করতে পারি?' মিসেস ম্যাকফারসন তাকালেন।

অবাক হয়ে গেলেন অর্জুন। না বলতে দ্বিধা হল তাঁর। বললেন, 'চেষ্টা তো করাই যায়। কিন্তু অনেক কিছু ভেবে রাখা দরকার।'

'ঠিক। তুমি ভাব। আমিও ভাবছি। এই কাজে আমরা সীমাকেও পাব।'

কিছুদিন পরে ব্যাপারটা এইভাবে এগিয়ে গেল। সংস্থার নাম ঠিক হল, ট্রানজিট। একটি অলাভজনক সেবা প্রতিষ্ঠান। আমেরিকায় এসে যেসব মেয়ে নিজেদের অজান্তে বিপদে পড়েছে এই সংস্থা তাদের সাহায্য করবে পুনর্বাসনের। সেইমতো সরকারি অনুমতির জন্যে আবেদন করা হল। আপাতত মিসেস ম্যাকফারসনের বাড়িই সংস্থার ঠিকানা। মার্কিন পুলিশের সদর দপ্তরে জানিয়ে দেওয়া হল, সংস্থার উদ্দেশ্য এবং এধরনের কেস এলে পুলিশ যেন সংস্থাকে খবর দেয়।

অর্জুন বলেছিলেন, 'আপনি যদি দেখেন সংখ্যা বাড়ছে তখন কী করবেন?'

মিসেস ম্যাকফারসন বললেন, 'সেই কথাই আমি তোমাকে বলব বলে ভাবছিলাম। কিন্তু তুমি কীভাবে নেবে বুঝতে পারছি না।'

'বেশ তো, বলুন।'

'তুমি যে বাড়িতে থাক সেখানে অন্তত আট-দশটা মেয়ের থাকা সম্ভব।'

'আমি কোথায় যাব?'

'একজন মেয়ের সঙ্গে থাকলে সমস্যা হয়। সাত-আটজনের গার্জেন হিসেবে থাকলে কি সেটা হবে?'

'হবে। তাহলে আমাকে অন্য জায়গা খুঁজতে হয়।'

সীমা শুনছিল পাশে বসে। বলল, 'আমি যদি সেখানে চলে যাই আর আপনি যদি আমার জায়গায় এখানে আসেন?'

সঙ্গে সঙ্গে হাত নাড়লেন প্রৌঢ়া, 'মাই গড। আমি কোনও পুরুষের সঙ্গে থাকতে পারব না।'

অর্জুন অবাক হয়ে বললেন, 'একী বলছেন আপনি? আমি তো আপনার ছেলের বয়সি।'

মিসেস ম্যাকফারসন বললেন, 'তুমি আমার নাতির বয়সি হলেও রাজি

হতাম না।' মাথা নাড়লেন তিনি, 'মিস্টার ম্যাকফারসনের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।'

সীমা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী রকম ব্যাপার?'

'আমার তখন ষোলো বছর বয়স। সবে ওঁর প্রেমে পড়েছি। হঠাৎ ভিয়েতনাম যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে নাম লেখালেন। আমি অনেক কান্নাকাটি করলাম। শেষে উনি নাম কাটাতে চাইলেও সরকার শুনল না। যাওয়ার আগের দিন হাডসনের পাশে দাঁড়িয়ে দু'জনেরই কী কান্না। বললেন, "তোমার ছবি পার্সে নিয়ে যাচ্ছি। যদি যুদ্ধে মারা যাই, নিশ্চয়ই খবর পাবে। কিন্তু তাই বলে সারাজীবন কুমারী থেকে নিজের জীবন নষ্ট কোরো না।' চেঁচিয়ে কেঁদে বলেছিলাম, 'তুমি ছাড়া আর কোনও পুরুষের সঙ্গে আমি বাস করতে পারব না।' তার পর তিনি ফিরে এলেন। আমাদের বিয়ে হল। অনেকদিন একসঙ্গে থাকার পর ক্যানসার ওকে কেড়ে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। কিন্তু ওকে দেওয়া কথা আমি কী করে ভাঙি বল?' মিসেস ম্যাকফারসনের চোখ চিকচিক করে উঠল। রুমালে মুছে নিলেন তিনি।

সরকারের কাছে আবেদন জানানো হল সাহায্যের জন্যে। মানবতার কথা ভেবে তাঁরা এগিয়েছেন দুর্ভাগ্যে পড়া মেয়েদের সাহায্য করতে। জাতিসঙ্ঘের কাছেও আবেদন জানান হল। আর অফিসের পর এই কাজে প্রচুর সময় চলে যেত, অর্জুন একটুও একঘেয়ে বোধ করতেন না।

আজ দুপুরে মিসেস ম্যাকফারসন ফোন করেছিলেন। কেনেডি এয়ারপোর্টে একটি মেয়ে কলকাতা থেকে এসে সমস্যায় পড়েছে। মেয়েটিকে তার স্বামীর আনতে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু কেউ এয়ারপোর্টে যায়নি। পুলিশকে মেয়েটি যে-ঠিকানা দিয়েছে, সেখানে খোঁজ করে ওই নামের কাউকে পায়নি। মিসেস ম্যাকফারসন বলেছিলেন, 'ডাটা, তুমি কি মনে কর এই মেয়েটিকে আমাদের সাহায্য করা উচিত?'

অর্জুন বলেছিল, 'এখনও এই মেয়ে অত্যাচারিতা নয়। তার স্বামী ঠিকঠাক জানত কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েটি যখন অ্যাডাল্ট তখন কোনও হোটেলে উঠে স্বামীর খোঁজ নিতে পারে। ভদ্রলোক কোন অফিসে চাকরি করেন, তা নিশ্চয়ই জানে।'

'তাহলে আমরা ইন্টারেস্টেড হব না বলছ?'

'আপনি কী বলেন?'

'একবার মেয়েটির সঙ্গে কথা বলো। পুলিশ সাড়ে তিনটেয় সময় দিয়েছে। তুমি যদি যাও তাহলে আমি ওদের ফোন করে দেব। এয়ারপোর্টের টার্মিনাল দুই-এ গিয়ে খোঁজ নিয়ো।' মিসেস ম্যাকফারসন বলেছিলেন।

অর্জুন ভেবেছিলেন লাঞ্চ সেরে যাবেন। মাঝখানে অহনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় একটু দেরি হয়ে গেল। গাড়ি নিয়ে কেনেডি এয়ারপোর্টের দিকে যাওয়ার সময় অহনার কথা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। অহনা একাই মেয়েকে মানুষ করছে—একথা বুঝতে তাঁর অসুবিধে হচ্ছে না। মেয়েটি এদেশের ছেলেমেয়েদের মতোই, স্বাভাবিক। অহনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নারীচরিত্র এক হয়ে গিয়ে মিশে গেছে বলে তাঁর ধারণা। ওর বন্ধু চেয়েছিল ক্ষতিপূরণ পেতে কিন্তু অহনা মিথ্যে কথা বলে টাকা আদায় করতে চায়নি। এই ব্যাপারটা অর্জুনকে খুব খুশি করেছে। কিন্তু একটা বাঙালি মেয়ে তো খুব খুশি হয়ে এইভাবে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকে না, তার পেছনের ইতিহাস নিশ্চয়ই খুব মর্মস্পর্শী। এই মেয়ে যখন ছোট তখন নিশ্চয়ই নির্যাতিতা মেয়েদের সাহায্য করার জন্যে কোনও সংস্থা এদেশে তৈরি হয়নি। অবশ্য অহনার মতো মেয়েরা তাদের সাহায্য ছাড়াই বেঁচে থাকে।

কেনেডি এয়ারপোর্টে ঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করা খুব মুশকিল। অনেক ঘোরাঘুরির পর বিশেষ সেলে যখন অর্জুন পৌঁছলেন তখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে।

মোটাসোটা ভাল মানুষ চেহারার অফিসারের নাম জন লেমন। অর্জুনের পরিচয় পেয়ে জন বললেন, 'ওঃ, তুমি এসে গিয়েছ? আমি বেঁচে গেলাম। তুমি কি ইন্ডিয়ান?'

'হ্যাঁ। ইন্ডিয়ান। বেঙ্গলি।'

'ওটা বোলো না।' হাসল জন।

'তার মানে?'

'এর পর নিশ্চয়ই বলবে না তোমার মাতৃভাষা বাংলা।'

'অফ কোর্স তাই।'

'মাই গড। তুমি কবে ইন্ডিয়ায় সিটিজেনশিপ নিয়েছ?'

'কখনওই নিইনি। আমার পূর্বপুরুষ জন্মেছেন ইন্ডিয়ায়, আমিও জন্মেছি।'

'তাহলে—! তুমি আমাকে মুশকিলে ফেললে।'

'ব্যাপারটা কী?'

'আমি জানি বেঙ্গলিরা থাকে বাংলাদেশে আর তাদের মাতৃভাষা বাংলা। এই ভাষার জন্যে তারা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আমি ভুল জানি?'

'অর্ধেকটা। বাংলাদেশ হওয়ার আগে ওই ভূখণ্ডের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। সেটা মাত্র চব্বিশ বছরের জন্যে। তার আগে দেশটা ছিল ইন্ডিয়ার অংশ। নাম ছিল বেঙ্গল। দেশ যখন ভাগ হল, ওয়েস্ট থেকে গেল ইন্ডিয়ায়। কিন্তু দুই অংশের লোক একই ভাষায় কথা বলে, লেখে, পড়ে। বুঝেছ?'

'কিন্তু ওরাই ভাষার জন্যে লড়াই করেছে। তোমরা করনি।'

'আমাদের সেটা করার দরকার হয়নি।'

'হয়তো।' লোকটা মচকায় কিন্তু ভাঙে না।

'মেয়েটির নাম কী?'

জন একটা ফর্ম তুলে অর্জুনের সামনে এগিয়ে দিল। অর্জুন সেটা পড়ল। মেয়েটির নাম স্বপ্না রায়। বয়স বাইশ। বাড়ি বর্ধমান শহরে। গ্র্যাজুয়েট। পাসপোর্ট নাম্বার এবং ভিসা নাম্বার লেখা আছে। স্বামীর নাম সলিল রায়। ঠিকানা যা মেয়েটি বলেছে, একশো তিন বাই দুই-এর বি চার্চ ম্যাকডোনাল্ড, ব্রুকলিন। নিউইয়র্ক। পাশে মন্তব্য, এই ঠিকানায় সলিল রায় বলে কেউ এখন থাকে না।

'ভদ্রমহিলা কোথায়?'

'আমার সঙ্গে মিসেস, কী যেন নামটা', আবার কাগজ দেখল জন, 'হ্যাঁ, মিসেস ম্যাকফারসন, ট্রানজিট—ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। দয়া করে তুমি মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে আমাকে উদ্ধার করো।'

'আগে ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'স্বচ্ছন্দে। এসো।' ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়াল জন।

ভেতরের ঘরে একটি সোফায় যে-মেয়েটি পা মুড়ে বসেছিল, তার গায়ের রং ফর্সা নয় কিন্তু চকচকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বললে কম বলা হয়। এরকম রঙ সাধারণত স্প্যানিশ মেয়েদেরই হয়। অর্জুন বললেন, 'নমস্কার ভাই। আমার নাম অর্জুন দত্ত। আমি ট্রানজিট নামের একটি সেবা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে আসছি।'

'উঃ। কতক্ষণ পরে বাংলা শুনলাম।' মেয়েটি পা নামাল।

'আপনার স্বামী কি জানতেন, আজ আপনি আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে কথা হয়েছিল?'

'টেলিফোনে।'

'এখানে এসে সেই নাম্বারে ফোন করেছেন?'

'হ্যাঁ। বলছে নাম্বারটা নেই।'

'বলুন তো নাম্বারটা?'

মেয়েটি নাম্বার বলতে অর্জুন সেলফোনের বোতাম টিপলেন। একই কথা। দিস নাম্বার ইজ নট একজিস্টিং। তার মানে, এককালে থাকলেও থাকতে পারে।

'আপনি কী করতে চান?'

'বুঝতে পারছি না। সেই সকালে নেমেছি। এরা অবশ্য খুব ভাল ব্যবহার করেছেন। খেতে দিয়েছেন। চেষ্টা করেছেন খুঁজে বের করতে। ও যে ইচ্ছে করে আমাকে নিতে আসবে না, তা আমি কল্পনাও করিনি।' মেয়েটির গলা ধরে এল।

'কান্নাকাটি করে কোনও লাভ হবে না স্বপ্না। আপনি কোন ফ্লাইটে এসেছেন।'

'ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে।' চোখ মুছল স্বপ্না।

'রিটার্ন টিকিট করে এসেছেন?'

'না, আমি থাকার ভিসা নিয়ে এসেছি।'

'আপনার সামনে দুটো অপশান খোলা আছে। আপনি দেশে ফিরে যেতে পারেন অথবা কোনও বন্ধু বা আত্মীয় থাকলে তাঁর বাড়িতে থেকে আপনার স্বামীর খোঁজখবর নিতে পারেন।' অর্জুন জানালেন।

'কিছু মনে করবেন না, আপনি কী করে ভাবলেন এই প্রাথমিক ব্যাপার বোঝার মতো বুদ্ধি আমার হয়নি?'

অর্জুন একটু অবাক হয়ে তাকালেন। দেশ থেকে প্রথমবার এসে পায়ের তলায় মাটি না পেলে ছেলেরাই যেরকম নার্ভাস হয়, এই মেয়ে তার ধারে কাছে নেই।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমি ওদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম এখানে সাধারণ কিন্তু ভদ্র

হোটেলের ভাড়া কত? ওরা বলল দেড়শ ডলার প্লাস ট্যাক্স পার ডে। আমি যা এনেছি তা দশ দিন থাকলেই প্রায় শেষ হয়ে যাবে। তখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোনও ইন্ডিয়ান সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি কিনা। এখানে রামকৃষ্ণ মিশন নেই?'

'অবশ্যই আছেন ওরা। তবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই।'

'তাহলে?'

'আপনার স্বামীর সঙ্গে বিয়ের আগে পরিচয় ছিল?'

'বিয়ে ঠিক হওয়ার পরে ফোনে কথা হত। রোজ কুড়ি মিনিট।'

'আচ্ছা। কোন নাম্বার থেকে ফোন করতেন?'

'ওর ফোন এলেই স্ক্রিনে ফুটে উঠত প্রাইভেট নাম্বার। জিজ্ঞাসা করলে বলেছে কার্ড কিনে ফোন করলে শস্তায় অনেকক্ষণ কথা বলা যায়।'

'শেষ কথা বলেছেন কবে?'

'এই তো, তিন দিন আগে।'

অর্জুন মিসেস ম্যাকফারসনকে ফোন করে ব্যাপারটা জানাল। 'স্বপ্না অত্যাচারিতা, স্বামী নিগৃহীতাদের দলে পড়েন না। অন্তত দিন দশেক হোটেলে থাকার সামর্থ্য তার আছে।'

মিসেস ম্যাকফারসন বললেন, 'তাহলে আমাদের তো কিছু করার নেই।'

'নেই। কিন্তু ওই টাকা শেষ হয়ে গেলে এদেশে আর ওঁর কোনও থাকার জায়গা থাকবে না। তা ছাড়া হঠাৎ ওর স্বামী কেন ডুব মারলেন—এটা আমার কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। ভদ্রলোককে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা দেখলে কেমন হয়?'

'মেয়েটি কি খুব অসহায় বলে মনে হচ্ছে?' মিসেস ম্যাকফারসন জিজ্ঞাসা করলেন।

স্বপ্নার দিকে তাকালেন অর্জুন। সোজা হয়ে বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ওই ভঙ্গি দেখে কেউ ওকে অসহায় বলে ভুল করবে না।

'ঠিক ততটা নয়—।' অর্জুন টেলিফোনে বলল।

'তাহলে দিন তিনেকের জন্যে একটা মাঝারি হোটেলে থাকুক। এর মধ্যে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে! রাখছি।'

এবাব জন ফিরে এল। 'ওকে। মনে হচ্ছে সব কিছু ঠিক আছে। আমার ডিউটি শেষ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা এবার বিদায় নিলে আমি খুশি হই।'

অর্জুন বলল, 'স্বপ্না, আপনাকে আমি একটি ভদ্র হোটেলে নিয়ে যাচ্ছি। খুব বেশি খরচ হবে না। ওখানে থেকে আপনি আপনার স্বামীর খোঁজ করতে পারবেন।'

'কতদিন?'

'আপাতত দিন তিনেক।'

ট্রলিতে মালপত্র চাপিয়ে পার্কিং-এ গিয়ে গাড়ির ডিকিতে ওগুলো তুললেন অর্জুন। মেয়েটা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে চোখে রোদ-চশমা পরে যেভাবে দৃশ্য দেখছে তাতে মনে হচ্ছে ওকে রিসিভ করতেই অর্জুন এসেছে!

স্টিয়ারিং-এ বসে অর্জুন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'উঠুন।'

গাড়িতে উঠে নিজে থেকেই বেল্ট বেঁধে নিয়ে স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় থাকেন? কতদূরে?'

'নিউজার্সিতে। আপনাকে আমি কুইন্সের একটা হোটেলে রেখে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'আমার ওপর সেরকম নির্দেশ রয়েছে।'

'কে দিয়েছে?'

'ট্রানজিট যিনি চালাচ্ছেন তাঁর নাম মিসেস ম্যাকফারসন।'

'নিউজার্সিতে হোটেল নেই?' স্বপ্না তাকাল, 'নিশ্চয়ই সেখানে কম ডলার লাগবে?'

অর্জুন হাসলেন, 'আপনি নিউইয়র্ক আর নিউজার্সির পার্থক্য জানেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী করে?' অবাক হলেন অর্জুন, 'আপনি তো এই প্রথম আসছেন।'

'নেট খুললে সব জানা যায়। আমাকে একটা রোডম্যাপ আর পাঁচ মিনিট সময় দিন, আপনাকে ঠিক বলে দিতে পারব কোন রাস্তায় গাড়ি চালাবেন।'

'বাঃ। গুড!'

'মানে?'

'আপনার পক্ষে আপনার স্বামীকে খুঁজে বের করা অসম্ভব হবে না।'

'আমাকে নিউজার্সিতে নিয়ে চলুন। হোটেলের ভাড়া তো মিসেস ম্যাকফারসন দেবেন না। দয়া করে আমার পকেটের কথা ভাবুন।'

নিউজার্সিতে বিখ্যাত হোটেলগুলোর শাখা আছে। অবশ্যই তাদের ঘরভাড়া ম্যানহাটনের মতো নয়। হাডসন, পেরিয়ে ক্লোস্টারের কাছাকাছি

ম্যারিয়ট হোটেলের পার্কিং-এ গাড়ি রেখে অর্জুন বললেন, 'এই হোটেলের পরিবেশ খুব ভদ্র।'

কিন্তু ঘরভাড়া শুনে চোখ কপালে তুলল স্বপ্না, 'পাগল!'

'সেই জন্যেই কুইন্সে থাকতে বলেছিলাম। ওখানে এর অর্ধেক দামে হোটেল পেতেন।' অর্জুন তাকালেন, 'মোটেলে থাকবেন?'

'মোটেল?'

'অর্ধেক টাকায় পেয়ে যাব।'

'টাকা?'

'ওই হল।'

'মোটেলে তো ট্রাক ড্রাইভাররা রাত কাটাতে থাকে। আমার মতো একটা মেয়ের পক্ষে ওখানে থাকা নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে আপনার?'

'ও। আপনি মোটেল সম্পর্কেও জেনে বসে আছেন!'

'চলুন।'

'কোথায়?'

'আমাদের ছোট্ট শহরে। কিছুদিন ধরে একটা গেস্ট হাউসের হোর্ডিং চোখে পড়ছিল। ছোট্ট শহর। শস্তাই হবে।'

গাড়িতে যেতে যেতে অর্জুন বললেন, 'আমার সেল নাম্বার আপনাকে দেব। আপনি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আমাকে ফোন করবেন না। কয়েক পা হাঁটলেই বাস পাবেন। সোজা আপনাকে সেন্ট্রাল পার্কে নিয়ে যাবে।'

স্বপ্না চুপ করে রইল।

দুর্ভাগ্য যে একা আসে না, তা আবার টের পেলেন অর্জুন।

টেক্সাস থেকে একটা বড় পার্টি আজই এসে গেস্ট হাউসের সব ঘর দখল করে নিয়েছে।

'কী করা যায় বলুন তো। এখন কুইন্সে যেতে হলে—। ওফ্।'

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'এই তো মিনিট তিনেকের ড্রাইভ।' বলেই সতর্ক হলেন অর্জুন, 'কেন?'

'আপনার মিসেস কী ধরনের মানুষ? বদরাগী না সন্দেহবাতিক?'

হাঁ হয়ে গেলেন অর্জুন। তার পর বললেন, 'দুটোর কোনওটাই নয়।'

'ফ্যান্টাস্টিক। চলুন। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

'সেই সুযোগ নেই। এখনও কেউ আমাকে বিয়ে করেনি।'

'যাচ্চলে। তাহলে আপনার বাড়িতে যেতে অসুবিধে কোথায়? ক'টা ঘর?'

'দেখুন। আমার ল্যান্ডলেডির সঙ্গে শর্ত হল প্রেমিকা ছাড়া আমি কোনও মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে যাব না। অনেক বছর হয়ে গেছে, উনি জেনে গেছেন যে, আমার কোনও প্রেমিকা নেই।'

'আপনার কখনও পক্স হয়েছিল?'

'না। কেন?'

'হতে কতক্ষণ? শুনুন, আপনার বাড়িতে যে আমি থাকব তা কেউ জানতে পারবে না। দিন সাতেক সময় দিন, তার মধ্যে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'যদি ল্যান্ডলেডি জানতে পারেন?'

'তাহলে বলবেন আমি আপনার প্রেমিকা।'

'প্রেমিকা?'

'বাল্য-প্রেমিকা। দেশ থেকে এসেছি।'

'আশ্চর্য। আপনার জন্যে আমি খামোকা মিথ্যে বলতে যাব কেন? সত্যি বলতে কী, আপনাকে মোটেও প্রেমিকা বলে ভাবতে পারছি না।'

'বাঁচা গেল।'

'মানে?'

'তাহলে আমি আপনার বাড়িতে নিরাপদে থাকব। চলুন।'

গাড়ি চালাতে চালাতে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি বলুন তো, আপনি এর আগে কখনও বিদেশে আসেননি?'

'না।'

'কলকাতার বাঙালি মেয়েরা এখন এতটা স্মার্ট হয়েছে?'

'গিয়ে দেখে আসুন।'

'আচ্ছা, আপনি সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের সঙ্গে এক বাড়িতে যে থাকতে যাচ্ছেন, আপনার স্বামীর কী প্রতিক্রিয়া হবে তা ভাবছেন না?'

'না।'

'কেন?'

'ভাবার সময় এলে ভাবব।'

যেখানে গাড়ি পার্ক করে তার পাশে একটা দরজা রয়েছে যেটা দিয়ে ঢুকলে সদর দরজা খুলতে হয় না।

দ্রুত মালপত্র ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে অর্জুন বললেন, 'যেটা

হালকা সেটা নিয়ে দোতলায় চলে আসুন। বাকিগুলো আমি পৌঁছে দিচ্ছি।'

'কেন? নীচেই তো একটা ঘর রয়েছে—।'

'না। আপনি ওপরে থাকলে কেউ জানতে পারবে না।'

'আপনার এখানে অনেকেই আসেন বুঝি!'

'আসতেই পারে। তবে তারা দোতলায় ওঠে না।'

দোতলার কোণের বেডরুমটা ছেড়ে দিয়ে অর্জুন বললেন, 'এই ঘর আপনার। অ্যাটাচড টয়লেট বাথ আছে। কিচেন অবশ্য একতলায়। খাবার দিয়ে যখন ডাকব তখন দয়া করে খেয়ে আসবেন। ফোন আছে, তবে দয়া করে দেশে পাঁচ মিনিটের বেশি ফোন করবেন না, নইলে আমি ফতুর হয়ে যাব।'

'আপনি কি পাশের ঘরে?'

'হ্যাঁ।' অর্জুন পা বাড়াতে গিয়ে থেমে দাঁড়ালেন, 'চা— কফি—?'

'কফি। দুধ-চিনি ছাড়া। আপনার খরচ কম হবে।'

অর্জুন কোনও কথা বললেন না।

মিসেস ম্যাকফারসনকে জানানো দরকার। ভদ্রমহিলার সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করছেন তিনি। কিন্তু এই মেয়ে এত ত্যাঁদোড়—। বছর তিরিশের নীচে বয়স অথচ র-কফি খায়? কলেজ জীবনে যারা ওই কফি খেত তাদের ইন্টেলেকচুয়াল বলে ভাবত সবাই।

কফির জল গরম হচ্ছিল, ফোন বাজল। গ্যারেজ থেকে ফোন করছে। গাড়ি সারাবার জন্যে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি যেসব কাগজ চেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল, যে-গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে যে-ডায়েরি করা হয়েছে, তার একটি কপি।

'আমি তো ডায়েরি করিনি।'

'সেকী! ঘটনাটা তো পুলিশ স্টেশনে অফিসার রিপোর্ট করেছে? আপনি আগামিকালই তার একটা কপি চান।'

'কত খরচ পড়েছে?'

'হাজার দেড়েক।'

'আমি একটু ভাবি। কাল ফোন করব আপনাকে?' ফোন বন্ধ করতে না করতেই স্বপ্নাকে দেখতে পেলেন অর্জুন। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নেমে এসেছে। বলল, 'ওপরের ঘরে কোনও অ্যাশ ট্রে নেই। নীচে আছে?'

'সরি। এই বাড়িটা স্মোক ফ্রি। যদি ধূমপানের নেশা থাকে তাহলে পেছনের দরজা খুলে ডেকে চলে যান। সিগারেটের শেষটা যেখানে সেখানে ফেলবেন না।' অর্জুন খুব বিরক্ত হয়ে কথাগুলো বলল।

স্বপ্না বলল, 'কী ভয়ংকর ব্যাপার! সিগারেট খেতে হলে প্রত্যেকবার বাড়ির বাইরে যেতে হবে? আপনাদের এখানে নিশ্চয়ই বৃষ্টি পড়ে?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। কিন্তু যে-কোনও সভ্য দেশের সভ্য মানুষেরা সিগারেট খাওয়া মানে শুধু আত্মহত্যা করাই মনে করে না, ঘরের অন্য মানুষ যিনি ধূমপান করেন না, তাঁর মৃত্যুকে এগিয়ে আনার জন্যে দায়ী করেন।'

কফি এগিয়ে দিলেন অর্জুন। কফির মগ নিয়ে স্বপ্না বলল, 'আপনার বাড়িতে যতক্ষণ থাকছি ততক্ষণ নির্দেশ মানতেই হবে।'

পেছনের দরজা খুলতে যাচ্ছিল স্বপ্না, মনে পড়ে যেতেই হাঁ হাঁ করে উঠলেন অর্জুন, 'আরে! দাঁড়ান, দাঁড়ান, সরি! আপনি বাইরে যাবেন না।'

'মানে?'

'আপনি যে এবাড়িতে আছেন তা প্রতিবেশীদের জানাতে চাই না।'

'ও হ্যাঁ। তাও তো ঠিক।' দাঁড়াল স্বপ্না, 'কিন্তু এখন তো রাত হয়ে গেছে, বাইরে আবছা অন্ধকার। আমি যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাই—?'

হেসে ফেললেন অর্জুন, 'দৃশ্যটা আরও আকর্ষণীয় হবে। ঠিক আছে, ওই জানলাটা একটু খুলে ওর পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরান।'

'ধন্যবাদ।'

কফি নিয়ে টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে বসে খানিকক্ষণ স্বপ্নাকে সিগারেট এবং কফি পান করতে দেখলেন অর্জুন। এদেশে এখনও সিগারেট বিক্রি হয় কারণ কিছু মহিলা নেশাটা ছাড়তে পারছেন না। দেশেও কি মেয়েরা এতটা স্মার্ট হয়ে উঠেছেন?

'আপনি ডিনারে রুটি না ভাত খান?' অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন।

'যা হোক কিছু হলেই চলে যাবে।'

'আমাকে রান্না করতে হবে।'

'আচ্ছা। আপনি রোজ রান্না করেন?' হাসল স্বপ্না।

জবাব দিলেন না অর্জুন। সিগারেট নিভিয়ে কফির কাপ নিয়ে স্বপ্না চলে এল কিচেনে। সিগারেটের পোড়া টুকরো ফেলে দিল গার্বেজের ব্যাগে। কফির কাপ ধুয়ে বলল, 'আমি যদি রান্না করি তাহলে আপনার আপত্তি আছে?'

অর্জুন তাকালেন, 'হ্যাঁ। আছে। প্রথমত আজ অনেকটা পথ উড়ে এসেছেন। বিশ্রাম করুন। দ্বিতীয়ত, কিচেনের কোন কৌটোয় কী আছে তা দেখিয়ে না দিলে আপনাকে হাতড়ে মরতে হবে। আপনি আপনার ঘরে চলে যান...।'

'ধন্যবাদ।' স্বপ্না আর দাঁড়াল না।

সকালে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে সোজা অফিস চলে এল অহনা। লিটন অফিসের কর্মচারীটিকে যা যা করণীয় তা বোঝাচ্ছিল। অহনাকে দেখে বলল, 'এই দ্যাখ, ডায়েরিতে লিখে রেখেছি কী কী কাজ তোকে করতে হবে। প্লিজ দেখে নিস। আমি আজ রাতেই যাচ্ছি। ফিরব সাত থেকে নয় দিনের মধ্যে।'

হঠাৎ চোখ বন্ধ করল অহনা, 'আচ্ছা, তোর বদলে আমি গেলে হবে না?'

'তুই যাবি? একটু টাফ, বারগেনিং করতে হবে অনেক। যদি পারিস চলে যা। আমার তো সুবিধে হয় তাহলে!' লিটন হাসল।

'কী রকম?'

'বউয়ের মাথাটা এখন একটু ঠান্ডা হয়েছে। কাছাকাছি থাকলে যদি আগের প্রেমটা ফিরে আসে! মানুষের মন তো, কিছুই বলা যায় না, বল!'

অহনা চুপচাপ লিটনের দিকে তাকিয়ে থাকল। লিটন জিজ্ঞাসা করল, 'কী দেখছিস?'

'তোকে বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'বিশ্বাস কর, আমি তো নিজেকেই বুঝতে পারি না।'

অহনা লিটনের দিকে তাকাল, 'তুই তো রবীন্দ্রনাথ পড়িসনি।'

'তো?'

'নষ্টনীড়ের চারুলতা তার দেবরকে ভালবাসে জেনেও চারুর স্বামী কখনও শাসন করেনি। কিন্তু চারু কখনও অমলের সঙ্গে গেস্ট হাউসে গিয়ে রাত কাটিয়ে আসেনি। তবু সে সময় কোনও পুরুষের পক্ষে মেনে নেওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল যে, তার স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে মানসিকভাবে ঘনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ একজন উদার মানুষের ছবি আঁকতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন, লোকটি তার নিজস্ব ভালবাসার কাছে কী অসহায়। চারু যদি একাধিক পুরুষের সঙ্গে উইক এন্ডে বাইরে যেত তাহলে তার স্বামী কতটা উদার হতে পারত, তাতে সন্দেহ আছে। রবীন্দ্রনাথও বোধহয়

মানতে পারতেন না। কিন্তু তুই পারছিস।' চেয়ারে বসে নিচু গলায় বলে গেল অহনা।

লিটন হাসল, 'হয় তো আর ও ভুল করবে না। আর নিশ্চয়ই আমার মধ্যে বেশ খামতি আছে বলেই ও করতে বাধ্য হয়েছে। অনেক মহিলাই যা মনে মনে ভাবে, তা ও বাস্তবে করে ফেলেছে। যাক গে, তুই ঢাকায় যাবি?'

মাথা নাড়ল অহনা, 'নাঃ। তৃণাকে একা রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। যতদিন না ও কলেজে যাচ্ছে ততদিন আমার মুক্তি নেই।'

'কিছু মনে করিস না। তুই যদি নিজেই বন্দি হয়ে থাকতে চাস—ওর বাবার সঙ্গে রেসপন্সিবিলিটিস শেয়ার করতে পারতিস—?'

'এতদিন যেটা পারিনি তা বাকি দু'-তিন বছরে পারব ভাবলি কী করে?'

লিটন লাঞ্চের সময় বেরিয়ে গেল। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কাগজপত্র সমেত সন্ধে নাগাদ এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে হবে ওকে। সারাটা দুপুর ধরে কাজের ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে অহনা কর্মচারীটিকে বলল যে, রোজ মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে অফিসে আসবে। ভদ্রলোক যেন এগারোটার মধ্যে চলে আসেন।

অফিস থেকে বেরুবার আগে লিটনকে ফোন করল সে। তৃণা আমসত্ত্ব খেতে খুব ভালবাসে। লিটন যদি দেশ থেকে নিয়ে আসে—। কিন্তু লিটনের সেলফোন বন্ধ।

তৃণাকে স্কুল থেকে তুলে বাড়ির দিকে যেতে যেতে একটা পিৎজার দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল অহনা, 'চটপট তোমার জন্যে একটা ছোট পিৎজা কিনে আন।'

'কেন?'

'লিটন আঙ্কল দেশে যাচ্ছে। ওর ফোন বন্ধ। ভাবছি এয়ারপোর্টে যাব।'

'আমিও যাব।'

'কেন?'

'আমি অনেকদিন এয়ারপোর্টে যাইনি।'

'তোমার টিচার আজ আসবে না?'

'ন'টার সময়। তার আগে ফিরতে পারব না?'

অহনা মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। তুমি পিৎজাটা নিয়ে এসো।'

'না। এয়ারপোর্টে গিয়ে যা খাওয়ার খাব।' তৃণা আবদার করল। মেয়েকে

নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়া মানে কোনও রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে আসা। এয়ারপোর্ট সম্পর্কে বাচ্চাদের একটা আলাদা কৌতূহল থাকে। অহনা আপত্তি করল না। ঢাকার জিয়া বিমানবন্দরের ভেতরে যাত্রী ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। জে এফ কে-তে এত কড়াকড়ি নেই। আগে তো প্লেনের দরজা পর্যন্ত চলে যাওয়া যেত, নাইন ইলেভেনের পর কাস্টমসের লাইন পর্যন্ত কাউকে বিদায় জানাতে যাওয়া যায়। ওই অবধি গেলে এয়ারপোর্টের অনেকটাই দেখা যায়। এয়ারপোর্টের রাস্তায় এমিরেটসের হোর্ডিং দেখে টার্মিনাল বিল্ডিং জেনে নিয়ে পার্কিং-এ গাড়ি পার্ক করল অহনা। আর তখনই তার মনে হল মীনার কথা। লিটন কি মীনাকে নিয়ে ঢাকায় যাচ্ছে? যদি ওদের মধ্যে আপাতত ভাব হয়ে থাকে তাহলে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। নইলে সাত-দশদিন এখানে একা থাকতে থাকতে মীনার কী পরিবর্তন হবে কেউ তা জানে না।

এমিরেটসের বোডিং কার্ড নেওয়ার কাউন্টারে লিটন নেই। হয়তো এখনও এসে পৌঁছায়নি। কিন্তু ইনফরমেশন বলছে, ওই ফ্লাইটের সিকিউরিটি চেকিং শুরু হয়ে গেছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে তড়িঘড়ি করা লিটনের অভ্যেস।

'মা খাব।'

অহনা মেয়েকে নিয়ে ম্যাকডোনাল্ডের সামনে এল। দু'প্লেট চিকেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর কেক নিয়ে রেস্টুরেন্টের সামনে সাজানো টেবিলে বসল এমন ভাবে, যাতে লিটন কাস্টমস করতে গেলে সে দেখতে পায়।

'আচ্ছা মা, তুমি তো ঢাকায় থাকতে এইসব খাবার খেতে না?'

'না।'

'কেন?'

'পাওয়া যেত না। গেলেও খেতাম না। আমাদের দেশে এর চেয়ে হাজারগুণ ভাল খাবার পাওয়া যায়।' খাওয়া শুরু করল অহনা।

শব্দ করে হাসল তৃণা। বিরক্ত হল অহনা।

'আই নো, সিঙ্গাড়া, নিমকি। হরিব্‌ল।'

'তুমি তো আমেরিকান, তাই একথা বলবে।'

'তুমিও তো আমেরিকান সিটিজেন?'

'বাধ্য হয়ে। মন থেকে নয়।'

'কেউ কাউকে বাধ্য করতে পারে?' তৃণা প্রতিবাদ করল।

'পারে। এই যেমন তুমি আমায় করেছ। তোমার জন্যে আমাকে এই দেশে থাকতে হচ্ছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শুধু টেনশন আর টেনশন!'

তৃণা কথা বাড়াল না।

মিনিট পাঁচেক পরে সে চাপা গলায় বলল, 'মা, লিটন আঙ্কল!'

চকিতে সোজা হয়ে তাকাল অহনা। কাস্টমস এনক্লোজারে ঢোকার মুখে মীনা আর লিটন দাঁড়িয়ে কথা বলছে। একজন কাস্টমস অফিসার চিৎকার করে কিছু বলতে মাথা নেড়ে ভেতরে ঢুকে গেল লিটন। ব্যাগটা এক্সরে যন্ত্রে দিতে না দিতেই মীনা গট গট করে হেঁটে চলে গেল উলটো দিকে। পকেট, প্যান্ট সার্চ করা হচ্ছে লিটনের। সেগুলো শেষ করার পর ব্যাগ তুলে লিটন যখন চোখের আড়ালে চলে গেল তখন সেলফোনের রিডায়াল বোতাম টিপতেই রিং শুনতে পেল অহনা।

'কীরে? তুই কোথায়?' লিটনের গলা।

'এয়ারপোর্টে। তোকে ঢুকতে দেখলাম।'

'আরে! ডাকলি না কেন?'

'শেষ মুহূর্তে দেখতে পেয়েছিলাম। তখন বউ-এর সঙ্গে', তৃণার দিকে তাকিয়ে কথা ঘোরাল অহনা, 'ডিস্টার্ব করতে চাইলাম না।'

'বোকা বোকা কথা। পৌঁছাতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। ভাল থাকিস।'

'শোন। পাঁচশো গ্রাম ভাল আমসত্ত্ব কিনে আনিস তো!'

'ধরবে।'

'স্যুটকেসে নিয়ে আসিস। ধরলে একটু ভেঙে খাইয়ে দিস।'

'বাই।'

সেলফোন অফ করতে তৃণা বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ মা।'

মেয়ের মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে মাথা নাড়ল অহনা, 'না। থ্যাঙ্ক ইউ বললে চলবে না। তোর পছন্দের একটা খাবার লিটনকে নিয়ে আসতে বললাম বলে তোর ভাল লাগল। তাই তো? আমার পছন্দের কোনও একটা কাজ তুই করিস, তাহলে আমারও ভাল লাগবে। চল।'

জে এফ কেনেডি এয়ারপোর্টের বিশাল এই টার্মিনালে পৃথিবীর অনেক দেশে যাওয়ার জন্যে প্লেনের বোর্ডিং কার্ড দেওয়া হচ্ছে টিকিটের বিনিময়ে। লাইন পড়েছে কাউন্টারগুলোর সামনে। ওরা দেখতে দেখতে হাঁটছিল।

তৃণা একটা বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'মা, দ্যাখো। লন্ডন, প্যারিস,

ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, দুবাই, ঢাকা, ক্যালকাটা, মুম্বাই, দেল্লি, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, সিডনি ওঃ, হাতের সামনে সমস্ত পৃথিবী।

অহনা হাসল, 'হ্যাঁ। এই পৃথিবীটাকে ঘুরে দেখতে হলে যোগ্যতার দরকার হয়। সেই যোগ্যতাটা অর্জন কর তুই, তাহলেই আমি খুশি হব।'

এয়ারপোর্টে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে পার্কিং-এর দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল অহনা। তৃণা চাপা গলায় বলল, 'মা, মীনা আন্টি!'

ততক্ষণে মাথা ঝিমঝিম করছিল অহনার। পার্কিং-এর আধা আলোয় একজন যুবককে জড়িয়ে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মীনা। আশেপাশে যে লোকজন যাতায়াত করছে, তাতে ওদের কিছুই যায়-আসছে না। এ দেশের ছেলেমেয়েরা যা করে, তা স্বচ্ছন্দে করছে ওরা। মীনা যখন ছেলেটিকে চুমু খেতে শুরু করল তখন তৃণা বলল, 'মা তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে চল।'

কিন্তু যেতে হলে ওদের পাশ দিয়ে হাঁটতে হবে। অথচ মেয়েকে পাশে নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখাও সম্ভব নয়।

প্রায় চোরের মতন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে গাড়িতে চলে এল অহনা তৃণাকে নিয়ে। মীনা তাদের দেখতে পায়নি, কেন না ওর বোধবুদ্ধি এখন লোপ পেয়ে গেছে। ছেলেটা অবশ্যই বাংলাদেশি এবং মীনার চেয়ে অন্তত বছর আটেকের ছোট। লিটন নিশ্চয়ই এখন প্লেনের সিটে বসে বেল্ট বেঁধে ফেলেছে। ও কি ভাবতে পারবে যে, ওকে সি-অফ করতে আসার আগে মীনা তার নবীন বয়ফ্রেন্ডকে এয়ারপোর্টে আসতে বলে রেখেছিল! স্বামীকে বিদায় দিয়ে দুনিয়াকে নস্যাৎ করে শরীরের খেলায় মেতেছে!

লিটন বলেছিল মীনা নিশ্চয়ই আর ভুল করবে না। লিটনের জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল অহনার। সে গাড়ি চালু করে বেশ দ্রুত গতিতে বাইরে বেরিয়ে আসতেই তৃণা বলল, 'মীনা আন্টির ওপর রাগ করে তুমি হাই স্পিডের জন্যে টিকিট খেতে চাইছ কেন?' অহনা গতি কমিয়ে দিল।

খারাপ লাগাটা বাড়ছিল। তৃণার সামনে এই দৃশ্য যদি দেখতে না হত তাহলে হয়তো এতটা খারাপ লাগত না! মীনা কী ধরনের মেয়ে, তা তো অজানা নয়। অনেকটা পথ যাওয়ার পর তৃণা বলল, 'মা। লিটন আঙ্কলকে বলবে?'

'এটা ওদের সমস্যা তৃণা।' গম্ভীর মুখে বলল অহনা।

'বাট, হি ইজ ইওর পার্টনার, বন্ধু।'

'তোমার লিটন আঙ্কল সব জানে।'

'মাই গড! তাহলে ওর কোনও ব্যাকবোন নেই।'

অহনার ইচ্ছে হচ্ছিল ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে মেয়ের গালে প্রচণ্ড জোরে একটা চড় কষিয়ে দিতে। কিন্তু সে কিছুই করল না।

সারাদিনে বার দুয়েক ফোন করেছিলেন অর্জুন। দু'বারই এনগেজড টোন শুনতে পেয়েছেন। ভেতরে ভেতরে একটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। স্বপ্নার পরিচিত লোকজন এদেশে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়নি। তাহলে কি শেষ পর্যন্ত সে স্বামীর হদিশ পেয়ে গেছে! পেয়ে গেলে টেলিফোন এনগেজড থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। ব্যাপারটা ভাবতেই খুশি হলেন অর্জুন। স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেলে স্বপ্না নিশ্চয়ই আজই নিজের সংসারে চলে যাবে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ফোন বাজল। গাড়ি থামিয়ে নাম্বার দেখে সেলফোন অন করলেন অর্জুন, 'গুড ইভনিং মিসেস ম্যাকফারসন।'

'ডাটা, তুমি এখন কোথায়?'

'এই মাত্র ক্রোস্টারে ঢুকেছি।'

'এয়ারপোর্ট পুলিশ ফোন করেছিল। যে-মেয়েটিকে কাল তুমি এনেছ তার ঠিকানা জানতে চাইছিল। আমি তোমাকে ওদের নাম্বার এস এম এস করে দিচ্ছি, তুমি একটু ওদের সঙ্গে কথা বল।' মিসেস ম্যাকফারসন বললেন।

'নিশ্চয়ই।'

লাইনটা কেটে দিয়ে হাসলেন অর্জুন। তাহলে ওরাও স্বপ্নার স্বামীর খোঁজ পেয়েছে। কিন্তু স্বপ্না কোথায় আছে, তা তো ওদের জানার কথা নয়। সেক্ষেত্রে খোঁজ পেলেও স্বপ্নার নাম্বার ওঁর স্বামীকে দিল কী করে? কিংবা দিতে পারছে না বলে ফোনে জানতে চেয়েছে। তাহলে কি স্বপ্না নিজেই স্বামীর দেওয়া নাম্বারে ডায়াল করতে করতে শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ করতে পেরেছে?'

এস এম এস এসে গেল। নাম্বারটা জনের সেল ফোনের।

ফোন করা মাত্র জনের গলা কানে এল, 'ইয়া।'

'জন, আমি অর্জুন, ট্রানজিটের হয়ে তোমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে দেখা করেছিলাম। স্বপ্নাকে—!'

অর্জুনকে কথা শেষ করতে দিল না জন। বেশ জোরে বলে উঠল, 'থ্যাঙ্ক

গড যে তুমি ফোন করেছ। সেই মেয়েটা এখন কোথায়?'

'কেন? এনি প্রবলেম?'

'মনে হচ্ছে ও যে-লোকটিকে এয়ারপোর্টে আশা করেছিল আমরা তার খোঁজ পেয়েছি। কিন্তু ভদ্রলোক মেয়েটির ব্যাপারে কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এমন কী মহিলা যে ওঁর স্ত্রী সে ব্যাপারেও স্পষ্ট বলছেন না। আমি লোকটার নাম্বার দিচ্ছি, তোমরা যোগাযোগ কর।'

'এক মিনিট!' বলে কাগজ-কলম বের করলেন অর্জুন। জন লোকটার নাম এবং টেলিফোন নাম্বার দিয়ে লাইন কেটে দিল।

কাগজটার দিকে তাকালেন অর্জুন। সলিল রায়। ফাইভ ওয়ান সিক্স দিয়ে যখন টেলিফোন নাম্বার শুরু, তখন লোকটা থাকে লং আইল্যান্ডে। নিউ ইয়র্কের ওই অঞ্চলে মোটামুটি উচ্চবিত্তের বাস। এই লোকটা যদি স্বপ্নার স্বামী হয় তাহলে স্ত্রী এদেশে এসেছে জানার পর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উদ্যোগী হওয়া উচিত। কিন্তু জন বলল, লোকটা স্পষ্ট কিছু বলেনি।

বাড়ি ফিরলেন অর্জুন। সমস্ত বাড়ি অন্ধকারে ডুবে আছে। ইচ্ছে করেই সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালালেন। স্বপ্নাকে তিনি বলেছিলেন কেউ যেন টের না পায় যে ও এখানে আছে। তাই বলে একটাও আলো না জ্বেলে ভূতের মতো থাকতে বলেননি। দোতলায় উঠে আলো জ্বালালেন। স্বপ্না যে-ঘরে আছে সেটির দরজা ভেজানো। টেলিফোন এনগেজড হয়ে থাকার কারণটা দেখতে পেলেন অর্জুন, রিসিভার নীচে নামানো। স্বাভাবিকভাবেই কোনও ফোন আসবে না। এর মানে কী? তিনি বাড়িতে না থাকলেও যেসব ফোন আসে সেগুলো ভয়েস মেলে শুনে ঠিক করেন কাকে ফোন ব্যাক করবেন। রিসিভার নামিয়ে রাখলে তো সেই সুযোগ থাকবে না।

ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন অর্জুন। শেষে স্বপ্নার বন্ধ দরজায় শব্দ করলেন। কোনও সাড়া নেই। দরজা একটু ফাঁক হলে দেখলেন ঘরের আলো জ্বালা নেই।

দরজা খুলে আলো জ্বালতেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন অর্জুন।

উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে স্বপ্না। পরনে খাটো রাত্রিবাস, যার নীচের দিকটা গুটিয়ে ওপরে উঠে এসেছে। আলো নিভিয়ে নীচে নেমে এলেন অর্জুন।

রাত্রের রান্না সেরে স্নান করে পোশাক পালটে নিয়ে বসার ঘরে চলে এসে গ্লাসে অল্প হুইস্কি আর বরফ ঢেলে সোফায় আরাম করে বসে জনের দেওয়া নাম্বার ডায়াল করলেন সেলফোনে।

গ্লাসে একটা চুমুক দিতে না দিতেই রিং শুনতে পেলেন। তারপরই একটা সরু গলায় প্রশ্ন ভেসে এল, 'হ্যালো, হু আর ইউ, প্লিজ?'

'মিস্টার সলিল রায়—?'

'ইয়েস।'

'নমস্কার। আমার নাম অর্জুন দত্ত। ট্রানজিট নামের একটি সেবাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি জড়িত। আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারি?'

'বলুন।'

'আপনার এই নাম্বার আমাদের দিয়েছেন জন নামের একজন সিকিউরিটি অফিসার যিনি এয়ারপোর্টে চাকরি করেন!'

'ওঃ।'

'আপনার স্ত্রীর নাম স্বপ্না?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। অর্জুন আবার প্রশ্ন করলেন।

সলিল রায় বললেন, 'আমি এই বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহী নই।'

'আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, স্বপ্না নিউইয়র্কে এসেছেন এবং সেটা আপনার সঙ্গে থেকে সংসার করার জন্যে। একজন মহিলা কলকাতা থেকে এতদূরে এসেছেন আপনার ভরসায়, আর আপনি কথা বলতেও আগ্রহী নন?'

'আপনার আর কিছু বলার আছে?'

'মিস্টার রায়, আপনি ঠিক ক্রিমিন্যালের মতো কথা বলছেন?'

ফোন রেখে দিল সলিল রায়। অর্জুন হতভম্ব। তাঁর মনে হল এই লোকটি কিছু কথা মুখের ওপর বলতে পারছেন না। কিন্তু সেটা কী কথা হতে পারে?

'গুড ইভনিং। আপনি কখন এসেছেন আমি বুঝতেই পারিনি।'

অর্জুন দেখলেন সেই রাত্রিবাসের ওপর একটা হালকা সুতোর জ্যাকেট চাপিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে স্বপ্না।

অর্জুন বললেন, 'গুড ইভনিং। বসুন।'

স্বপ্না বসল না। তার চোখ অর্জুনের গ্লাস ছুঁয়ে গেল।

অর্জুন বললেন, 'আপনি যাঁকে স্বামী বলে ক্লেম করেছেন, সেই সলিলবাবুর সঙ্গে এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির কথা হয়েছে। তারা আমাকে নাম্বার দিয়েছে।

একটু আগে আমিও কথা বললাম। আপনার প্রতিক্রিয়া কী?'

'ফাইন।'

অর্জুন স্বপ্নাকে দেখলেন, 'সলিলবাবু আপনার ব্যাপারে কোনও কথা বলতে রাজি হলেন না। এমন কি উনি যে আপনার স্বামী, তাও সরাসরি স্বীকার করলেন না।'

চোখ সরালেন না অর্জুন। স্বপ্নার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল, 'আপনারা খুব সমস্যায় পড়ে গেলেন, তাই তো?'

'আশ্চর্য! সমস্যাটা আপনার। আমাদের নয়। এদেশে এসব করে কেউ আইনের হাত থেকে বাঁচতে পারে না। আপনি এখনই ওর সঙ্গে কথা বলুন। যদি উনি কথা বলতে রাজি না হন তাহলে কাল সকালে ওর বিরুদ্ধে পুলিশকে রিপোর্ট করুন। দেখবেন, রাতারাতি ওর অ্যাটিচ্যুড বদলে যাবে।' অর্জুন বললেন।

'যদি না বদলায়?'

'বদলাবেই। এদেশের আইন এ-ব্যাপারে খুব কড়া। সলিল কি গ্রিনকার্ড হোল্ডার না সিটিজেন?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'যাই হোক, ও আপনাকে স্পনসর করেছে স্বামী হিসেবে। অতএব এখানে আসার পর সব দায়িত্ব ওকেই নিতে হবে। আমার তো মনে হচ্ছে সীমার কেস রিপিট হচ্ছে। এদেশের বেশ কিছু ছেলে দেশে গিয়ে বিয়ে করে বিনা পয়সায় মেড সার্ভেন্ট নিয়ে আসবে বলে। এরা কোনও বাঙালির সঙ্গে মেলামেশা করে না। হিস্প্যানিক বা ওই জাতীয় সাদা চামড়ার মেয়ের সঙ্গে স্টে-টুগেদার করে। বোধহয় কোনও কারণে সলিল এয়ারপোর্টে আপনাকে রিসিভ করতে যেতে পারেনি। হয়তো তারিখ বা সময় গুলিয়ে ফেলেছিল কিংবা অন্য কোনও কারণ। কিন্তু তারপর যে-ই ও জানতে পেরেছে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে, আমি বাঙালি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে এড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। ইডিয়ট।' একনাগাড়ে বলে গেলেন অর্জুন।

'তাহলে, যে-ফোনে দেশ থেকে কথা বলেছি সেটা আর নেই কেন?'

'হয়তো সেলফোনে বদলেছে। সিমকার্ড খুলে রেখেছে। আমি যে-নাম্বারে কথা বলেছি, সেটা আপনার দেওয়া নাম্বার নয়। আমি রি-ডায়াল করে দিচ্ছি, আপনি কথা বলুন।' সেলফোনের নাম্বার টিপে ওটা স্বপ্নার

হাতে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়ালেন অর্জুন।

'আপনি উঠে যাচ্ছেন কেন?'

'আপনারা স্বামী-স্ত্রী, কথা বলুন।' অর্জুন গ্লাসটা তুলে এনেছিলেন। কিচেনে ঢুকে কয়েকটা কাজু বাদাম প্লেটে ঢেলে নিলেন। সলিল তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়নি কিন্তু বউয়ের গলা পেলে নিশ্চয়ই একই কথা বলতে পারবে না। একটা বাদাম মুখে পুরে গ্লাসে চুমুক দিলেন অর্জুন।

'এই নিন।' সেলফোনটা এগিয়ে দিল স্বপ্না কিচেনের সামনে এসে।

ওটা নিয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, 'কথা হল?'

'হ্যাঁ। আমি একটা সিগারেট খেয়ে আসব?'

'সিগারেট? আজ সারাদিনে কিছু খেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী খেয়েছেন?'

'ফ্যান্টাস্টিক খাবার। ভাত, আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ আর মাখন।'

'আপনি করে নিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিচেন দেখে তো সেটা টের পাইনি।'

'মেয়েরা কিচেনটাকে অনেক বেশি পরিষ্কার রাখতে পছন্দ করে।' স্বপ্না এগিয়ে গেল পেছনের জানলার কাছে। সেটাকে খুলে দিয়ে সিগারেট ধরাল। গ্লাসটাকে শেষ করে অর্জুন দূর থেকে স্বপ্নাকে দেখলেন। চোখ বন্ধ করে সিগারেট খাচ্ছে। নিশ্চয়ই দেশ থেকে বেশ কয়েকটা প্যাকেট নিয়ে এসেছে। ওগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পর বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল। চার পাঁচ ডলারের নীচে সিগারেটের প্যাকেট পাবে না আমেরিকায়।

কিন্তু সলিল কী বলল সেটা না জানিয়েই সিগারেট খেতে চলে গেল মেয়েটা? স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত কথা শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাঁর নেই, ওদের মধ্যে যদি কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে তাহলে সেটা মিটে গেলে, এটুকু জানিয়ে যেতে তো পারত। এমন কিছু কচি খুকি নয় মেয়েটা যে সবসময় নিজের খেয়ালে চলবে।

সিগারেট খেয়ে এসে স্বপ্না বলল, 'আজ একটা অন্যায় কাজ করতে বাধ্য হয়েছি।'

'কীরকম?'

'পর পর ফোন আসছিল, আমার তো ধরা নিষেধ। তাই রিসিভার নামিয়ে রেখেছিলাম। না রাখলে ঘুমের বারোটা বেজে যেত।'

'ওটা সাইলেন্স মোডে রাখা যায়।'

'তাই! গাঁয়ের লোক তো, বুঝতে পারিনি।'

অর্জুন দ্রুত চলে গেলেন বসার ঘরে। আর এক পেগ গ্লাসে ঢাললেন। পেছন পেছন এসেছিল স্বপ্না, 'একী! আপনি আবার খাচ্ছেন?'

'তো?' অর্জুন তাকালেন।

'আপনার নেশা হয়ে যাবে না?'

'হলে হবে। লুক, এটা আমার বাড়ি। আমার বাড়িতে আমি প্রতিবেশীদের বিরক্ত না করে যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।'

'সর্বনাশ। প্লিজ খাবেন না।'

'আঃ। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?'

'এই যে বললেন, যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।'

'ওফ্।'

'আপনি রাগ করলেন?'

'আপনি কখনও কোনও ভদ্রলোককে মদ খেতে দ্যাখেননি?'

'দেখেছি।' মাথা নাড়ল স্বপ্না, 'খাওয়ার শুরুতে তারা ভদ্রভাবে আমাকে অফার করেছেন। আমি অবশ্য অফার অ্যাকসেপ্ট করিনি।'

'আই অ্যাম সরি। আপনি কি একটা ড্রিঙ্ক নেবেন?'

'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন—।'

মিষ্টি হাসল স্বপ্না।

এরকম অবাক বোধহয় কখনও হননি অর্জুন। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে সেলার থেকে রেড ওয়াইনের বোতল বের করে কিছুটা গ্লাসে ঢাললেন।

'ওটা কী?' স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল।

'ওয়াইন।'

'ও। প্লেনে খেয়েছি। নামেই ওয়াইন কিন্তু কোকের চেয়েও নরম।'

'ক'গ্লাস খেয়েছেন?'

'একটাই।'

'পাঁচটা খেলে সোজা দাঁড়াতে পারবেন না।' গ্লাসটা দিলেন অর্জুন।

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

অর্জুন মাথা ঝাঁকালেন। স্বপ্না বলল, 'চিয়ার্স।'

অর্জুন সোফায় বসে বললেন, 'আনন্দ।'

'বাঃ। বেশ মিষ্টি।' এক চুমুক খেয়ে হাসল স্বপ্না।

'এবার বলুন, সলিলবাবু কবে আসছেন?'

'কবে আসছেন মানে?'

'যেহেতু আপনি এখানে নতুন, তাই উনি নিশ্চয়ই আপনাকে নিয়ে যেতে আসবেন। সময়টা যদি বিকেলে হয় তাহলে আমি থাকতে পারি।'

'ও।' গ্লাসে আর একটা চুমুক দিল স্বপ্না, 'নাঃ, উনি আসবেন না।'

'সেকী? কেন?' চেঁচিয়ে উঠলেন অর্জুন।

'ওঁর পক্ষে নাকি আমাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি তো ওঁর কাছেই এসেছেন?'

'উনি সেটা মনে করেন না।'

'মনে করেন না বললেই হল!' ঘড়ি দেখলেন অর্জুন, 'যদিও রাত হচ্ছে, তবু, চলুন এখনই।'

'কোথায়?'

'থানায়।'

'থানায় গিয়ে কী হবে?'

'সিগারেট খাচ্ছেন, ওয়াইন খাচ্ছেন আর কেন থানায় যাবেন বুঝতে পারছেন না? আপনি কী?'

'আমি...আমি...। থানায় গিয়ে কী বলব?'

'ওর বিরুদ্ধে কমপ্লেন করবেন। ওর ভরসায় এদেশে এসেছেন। উনি আপনার স্বামী। অথচ সেই দায়িত্ব উনি পালন করছেন না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল স্বপ্না। গ্লাসটা শেষ করল। তারপর বলল, 'এর চেয়ে কোক খাওয়া ভাল ছিল!'

'তাই বলে আপনাকে আমি হুইস্কি অফার করছি না।'

'করবেন না। আপনার জিনিস, না অফার করার রাইট আপনার আছে। আমার এইটে আর খেতে ভাল লাগছে না। যা মিষ্টি!'

'আপনি কথা ঘোরাচ্ছেন কেন বলুন তো?'

'বেশ। আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, ভাল ব্যবহার করছেন, তাই আপনাকে ব্যাপারটা বলা দরকার।' মুখ ওপরে তুলল স্বপ্না, 'এই সলিল

রায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু এখন ডিভোর্স হয়ে গেছে।'

'সেকী!' অর্জুন মিইয়ে গেলেন।

'সলিল রায় আমার এক বান্ধবীর মাসতুতো দাদা। বছর চারেক আগে যখন দেশে গিয়েছিলেন, তখন আমার সঙ্গে আলাপ হয়। আমি সেই বছর এম বি এ করে একটা চাকরিতে ঢুকেছি। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল আমেরিকায় চাকরি করতে যাব। পড়তে পড়তেই ইন্টারনেটে অ্যাপ্লাই করেছি অনেক। তেমন ভাবে রেসপন্স পাইনি। শেষে একটা কোম্পানি বলল, আমি যদি নিজের চেষ্টায় ভিসা জোগাড় করে এদেশে আসতে পারি তাহলে ওরা বছরে চল্লিশ হাজার ডলারের চাকরি দেবে। সলিল রায় বললেন, চল্লিশ হাজার ডলার এক জনের পক্ষে অনেক।

'কিন্তু ট্র্যাভেল এজেন্ট বললেন, আমেরিকান গভর্নমেন্ট আমাকে ভিসা দেবে না। প্রথম কথা আমি অবিবাহিতা, কোনও ইনকাম ট্যাক্স দিই না। দেশে আমার নামে কোনও অ্যাসেট নেই। আমাকে ভিসা দিলে আমি কখনওই ভারতে ফিরে যাব না। খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।' হাসল স্বপ্না।

'তারপর?'

'পরের বছর যখন সলিল রায় গেলেন তখন তাঁকে খুব ধরলাম। তিনি বললেন, আমি যদি কোনও আমেরিকান সিটিজেনকে বিয়ে করতে পারি তা হলে ভিসা পেতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু আমি আমেরিকান সিটিজেন কোথায় পাব? জানেন, আমি প্রবাসী আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলাম, আমেরিকান বাঙালি পাত্র চাই বলে। গোটা তিনেক মেল এল আমার কমপিউটারে। কিন্তু তিনজনেই প্রস্তাব দিল তারা বিয়ের আগে আমার সঙ্গে দিন কয়েক থাকতে চায়। থেকে দেখবে, আমাদের সম্পর্ক টিকবে কিনা। আমি রাজি হইনি।

'গত বছর যখন সলিল রায় আবার দেশে গেলেন তখন তাকে সমস্যার কথা বললাম। উনি স্পষ্ট বললেন, এখন নাকি যাচাই না করে কেউ বিয়ে করে না। অথবা বিয়ের জন্যে টাকা চায়। পেপার ম্যারেজ। কন্ডিশন থাকবে বিয়ের ছয় মাসের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যাবে, কিন্তু তার জন্যে দু'লক্ষ টাকা দিতে হবে। আমি রাজি হলাম।'

'রাজি হয়ে গেলেন?'

'হ্যাঁ। জমানো টাকা কিছু ছিল। বাকিটা জোগাড় করলাম। বিয়ের নোটিস

দেওয়া হল। তিন মাস পরে আবার ফিরে গিয়ে সলিলবাবু আমাকে বিয়ে করলেন। সেই দিনই মিউচুয়াল ডিভোর্সের অ্যাপ্লিকেশনে সইসাবুদ করা হল। ব্যাপারটা গোপনে রাখার চুক্তি হয়েছিল। সলিলবাবু আমার সঙ্গে আলাদা কোনও সময় কাটাননি। কারণ উনি নাকি একটি কোরিয়ান মেয়ের সঙ্গে স্টেডি স্টে-টুগেদার করেন। ফিরে গিয়ে উনি আমাকে কাগজপত্র পাঠালেন। সেগুলো জমা দিয়ে, বিয়ের সার্টিফিকেট সমেত আবেদন করলাম ভিসার জন্যে। এক বছরের জন্যে ভিসা পেয়ে গেলাম। এখানে এসে আবেদন করলে ওটার মেয়াদ বাড়বে। ইতিমধ্যে তিন মাস হয়ে গিয়েছে। ডিভোর্সের কেস উঠল কোর্টে। মিউচুয়াল আবেদন বলে মাস দুয়েকের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদও হয়ে গেল।

'বাবা আমার বিয়ের জন্যে যে-টাকা রেখেছিলেন, তাই দিয়ে সব ধার শোধ করে, টিকিট কিনে চলে আসার আগে সলিলবাবুকে ফোন করেছিলাম। উনি বলেছিলেন, চুক্তি অনুযায়ী যা করার উনি করেছেন। যেহেতু আমি ওর মাসতুতো বোনের বান্ধবী তাই এদেশে আসার পর কিছুদিন যাতে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি সেই ব্যবস্থা উনি করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমি যেন কাউকে ওঁর স্ত্রী বলে পরিচয় না দিই। এয়ারপোর্টে ওঁকে না দেখে আমি সেই ভুলটা করে ফেললাম।'

মাথা নাড়ল স্বপ্না।

'কী করে ভুল হল?' অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'অচেনা অজানা এয়ারপোর্টের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছি স্যুটকেস নিয়ে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, সলিল রায় এখনই এসে পড়বেন। নিজের বাড়িতে নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু কয়েক দিনের জন্যে আমার থাকার জায়গার ব্যবস্থা করেই আসছেন। লোকটি কাগজে কলমে আমার স্বামী ছিল, কয়েক মাসের জন্যেও তো ছিল। সেই সময়ে আমি ওর স্ত্রী হিসেবে ভিসার আবেদন করেছিলাম, পেয়েও গেছি। হ্যাঁ, দুই লাখ টাকা দিতে হয়েছে আমাকে কিন্তু সেটা তো ও জোর করে বা ঠকিয়ে নেয়নি। এদেশে আসার মূল্য হিসেবে ওটা দিয়েছি। কিন্তু সেই সঙ্গে হয়তো মনে হয়েছিল, সলিল রায় ওঁর কথা রাখবেন। অথচ ঘণ্টা তিনেক চলে গেলেও যখন উনি এলেন না তখন কী রকম নার্ভাস হয়ে গেলাম। এই সময় একজন ইউনিফর্ম পরা লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করল কোনও সমস্যায় পড়েছি নাকি। তাকে

বললাম, আমাকে রিসিভ করতে যার আসার কথা ছিল যে এখনও আসেনি। লোকটা পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম, 'উনি আমার স্বামী।' মনে হয়েছিল স্বামী বললে লোকটা খুশি হয়ে চলে যাবে। কিন্তু তার বদলে লোকটা আমাকে এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি অফিসে নিয়ে গিয়ে জনের কাছে ব্যাপারটা জানাল। আমি বাধ্য হলাম স্বামী-স্ত্রীর গল্পটাকে চালিয়ে যেতে। জন আমাকে বলল সলিল রায়কে ফোন করতে। ভয়ে ভয়ে ফোন করতেই শুনতে পেলাম, দিস নাম্বার ইজ নট একজিস্টিং। বিশ্বাস করুন, শুনে বুক জুড়িয়ে গেল। অথচ ওই নম্বরেই আমি দেশ থেকে ফোন করেছি সলিল রায়কে। নিশ্চয়ই আমার গলা শুনতে চায় না বলে মোবাইলে কিছু একটা করেছে। জন চেষ্টা করল কয়েকবার। তার পরের ঘটনাটা আপনার জানা।'

অর্জুন উঠলেন। হলঘরটা হেঁটে পেরিয়ে গিয়ে তৃতীয় পেগ গ্লাসে ঢাললেন, 'স্বপ্না। আপনি এদেশে এসেছেন বেআইনি ভাবে। সলিল রায়ের স্ত্রী হিসেবে ভিসা পেয়েছিলেন কিন্তু এদেশে আসার আগেই আপনাদের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল। মার্কিন সরকার জানতে পারলে আপনার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনতে পারে। আগে জানলে আপনাকে এই বাড়িতে নিয়ে আসতাম না।'

'কেন?'

'একজন জালিয়াতকে সাহায্য করার অভিযোগ আমার বিরুদ্ধেও উঠবে।' অর্জুন গ্লাসে চুমুক দিলেন, 'এখন কী করবেন?'

'আমি কিছুদিন এখানে থেকে কাজ খুঁজে নিলে আপনার অসুবিধে হবে?'

'অবশ্যই।'

'আপনাদের সেবা প্রতিষ্ঠানে জায়গা পেতে পারি না?'

'সম্ভবত নয়। কারণ ওখানে নির্যাতিতা অথবা প্রতারিতা মেয়েদের আশ্রয় দেওয়া হয়।' অর্জুন গম্ভীর গলায় বললেন।

'আপনি রিকোয়েস্ট করলেও হবে না?'

'আমি কেন আপনার জন্যে বলব? আপনাকে আমি চিনিই না। তা ছাড়া আপনি আইন-বিরুদ্ধ কাজ করে এদেশে এসেছেন।'

'ও! তাহলে একটা উপকার করুন।' হেঁটে এসে সোফায় বসল স্বপ্না, 'পুলিশকে ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে দিন। ওরা নিশ্চয়ই আমাকে ধরে

নিয়ে যাবে। ফলে থাকার জন্যে মাথার ওপরে ছাদ পাওয়া যাবে, খেতেও নিশ্চয়ই দেবে?'

'আপনি, আপনি তো দেখছি উন্মাদ!'

'তাই? বেশ, আমাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিন। যে-কোনও চাকরি, যাতে দু'তিন মাস নিজের খরচ চালাতে পারি। আশা করি ওই সময়ের মধ্যে আমি আমার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পেয়ে যাব।'

'আপনি অড জব করতে পারেন, কিন্তু ভাল চাকরি পাবেন না। কারণ আপনি এদেশে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে এসেছেন।' অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র টেলিফোন বাজল। এগিয়ে গিয়ে বিরক্ত হয়েই রিসিভার তুললেন অর্জুন, 'হ্যালো!'

'এত রাত্রে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আমি অহনা আমিন বলছি।'

'ও। বলুন।'

'একটা বিশেষ অনুরোধ করছি। কাল সকালে, যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সেখানকার থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করবেন। আমি আপনার গাড়িকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছি, ফলে গাড়ির ক্ষতি হয়েছে।'

'হঠাৎ?'

'যা সত্যি, তা বলাই ভাল। লিটনের পরামর্শে এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। এর ফলে আমরা দু'জন ইন্স্যুরেন্স থেকে সারানোর খরচ পাব।'

'পাবেন। কিন্তু অসংযত ড্রাইভিং-এর জন্যে আপনি শাস্তি পেতে পারেন।'

'পারি। তবে সেটা আপনি কী ধরনের অভিযোগ করছেন, তার ওপর নির্ভর করছে। আমার গাড়ির নাম্বার আপনার মনে আছে?'

'বলুন।'

অহনা নাম্বার বললে লিখে নিলেন অর্জুন। তারপর বললেন, 'আমি চাই না আপনার শাস্তি হোক। দেখি, কীভাবে রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচা যায়।'

রিসিভার নামিয়ে রাখতেই স্বপ্না বলল, 'আপনি শুধু চান আমার শাস্তি হোক।'

'হওয়া উচিত। ধারধোর করে একটা পেপার ম্যারেজ বানিয়ে এদেশে এসেছেন। কেন এসেছেন? কী আছে এখানে? আমেরিকায় এলে কোন স্বর্গবাস হবে আপনার? শুনলেই মাথায় আগুন জ্বলে। কোনও মেয়ে এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে কেন? না, তার শখ আমেরিকায় এসে থাকার।' অর্জুন গজগজ করছিলেন।

'আপনি আছেন কেন এখানে?' খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল স্বপ্না।

'আমার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করবেন না।'

'কেন? আপনি দেশে থেকে চাকরি-বাকরি করলেন না কেন?'

'তার কৈফিয়ত আপনাকে দেব'না।' গ্লাস শেষ করে অর্জুন বললেন, 'আমি শুতে চললাম। কাল সকাল ন'টার মধ্যে দয়া করে আমাকে নিষ্কৃতি দিলে আমি খুশি হব।' লম্বা পা ফেলে সিঁড়ির মুখে এসে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, 'ওপরে ওঠার আগে নীচের সব আলো নিভিয়ে দেবেন।'

'আপনি খাবেন না?'

'না।'

'আশ্চর্য! খাবারটা কী দোষ করল? চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খায় তো মেয়েরা, আপনি কেন তাই করছেন?'

'স্বপ্না, প্লিজ, আমাকে জ্ঞান দেবেন না।'

'শিশুর মতো আচরণ করতে দেখলে মুখ বন্ধ রাখা যায় না।'

'আমি শিশু? আপনার থেকে অ্যাটলিস্ট বারো বছরের বড় আমি!'

'আপনি তাহলে মানুষ হিসেবে ভাল নন।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'মিড থার্টিতেও কোনও স্টেডি বান্ধবী আপনার নেই, কেউ বিয়েও করেনি। এদেশে তো বান্ধবী পেতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তা সত্ত্বেও আপনি যখন একা, তখন বুঝতে হবে আপনার মধ্যে কোনও গোলমাল আছে।' ঠোঁট বেঁকাল স্বপ্না।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে কোনও কথা না বলে অর্জুন ওপরে উঠে গেলেন। তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ায় শব্দ পাওয়া গেল।

স্বপ্না কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। তারপর কিচেনের আলো, হলঘরের আলো নিভিয়ে বসার ঘরের আলো নেভাতে গিয়ে হুইস্কির বোতলটাকে দেখতে পেল। ওটা তুলে রেখে যাননি অর্জুন। বোতলটাকে সেলারে রাখার জন্যে তুলতেই মনে ইচ্ছে এল। গ্লাসে খানিকটা ঢেলে আরাম করে সোফায় বসল সে।

কাল সকালে অর্জুন চলে যেতে বলেছেন। কোথায় যাবে সে? তার এখনও মনে হচ্ছে না, সে এখানে সলিল রায়ের পরিচয় নিয়ে এসে ভুল করেছে। সলিল রায়কে দু'লক্ষ টাকা দিয়ে সে আসার অধিকার কিনেছিল।

জল বা বরফ ছাড়া হুইস্কি গলা দিয়ে নামার সময় সারা শরীরে তীব্র গরম অনুভূতি ছড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকার পর জ্বলুনি কমে এলে, স্বপ্নার বেশ আরাম লাগল। সে আবার চুমুক দিল। এবার আর আগের মতো গলা জ্বলছে না।

ঝিমুনি এসেছিল, টেলিফোনের রিং কানে আসতেই তড়াক করে সোজা হল স্বপ্না। এই ঘর ছাড়া বাড়িটা এখন অন্ধকারে ডুবে আছে। কোথাও আর কোনও শব্দ না থাকায় টেলিফোনের আওয়াজটা আরও জোরালো লাগছে। অর্জুন দত্ত নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন। রিসিভার তুলে হ্যালো বলতে ইচ্ছে হল। এত রাত্রে যে ফোন করছে, তার নিশ্চয়ই খুব প্রয়োজন আছে। উঠতে গিয়েও উঠল না স্বপ্না। সে যে এই বাড়িতে আছে, তা কাউকে জানানো চলবে না। ফোনে কথা বললে তার অস্তিত্ব আর গোপনে থাকবে না।

টেলিফোনের রিং থেমে গেল। যে করেছিল সে নিশ্চয়ই হতাশ হয়ে ছেড়ে দিয়েছে। গ্লাসের দিকে তাকাল স্বপ্না। শেষ হয়ে গেছে। আবার ঢালল, এবার একটু বেশি। চুমুক দিতেই মনে হল হাত পায়ের আঙুলগুলো শিরশির করছে। কাল চলে যেতে হবে। কোথায় যাব? সলিলের বাড়ি গিয়ে বলতেই পারে, আপনি কয়েকদিন টেক কেয়ার করবেন বলেছিলেন, কথার খেলাপ করছেন কেন? একবার গেলে কি অস্বীকার করতে পারবেন সলিল!

না, অসম্ভব। সেখানে নিশ্চয়ই কোরিয়ান মেয়েটা থাকে। আচ্ছা, কোরিয়ান মেয়েরা কি সুন্দরী হয়? খাটো চেহারার নাক বোঁচা মেয়ের গায়ের চামড়া ফর্সা। তাকে বিয়ে করেননি সলিল। অথচ একসঙ্গে থাকেন। কোনও অঙ্গীকার কি নেই? কে জানে।

'এটা কী হচ্ছে?'

অর্জুনের গলা কানে আসতে মুখ ফেরাল স্বপ্না। লোকটাকে যেন একটু ঝাপসা দেখাচ্ছে। সে হাসার চেষ্টা করল।

'আপনি এখানে বসে হুইস্কি খাচ্ছেন?' প্রচণ্ড বিরক্ত অর্জুন।

'খুউব ভাল খেতে।'

'আপনার মতলবটা কী বলুন তো?'

'কিছু না। এটা খুব এনজয় করছি।'

'ওটা রাখুন। ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন!'

'থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর উপদেশ।'

'আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি না। অর্ডার করছি।'

'রিয়েলি?' একটা বড় চুমুক দিল স্বপ্না।

অর্জুন এগিয়ে এসে বোতলটাকে তুলে সেলারে রাখলেন। তারপর স্বপ্নার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'উঠুন।'

'আপনি যান, আমি যাচ্ছি।'

'আমার সঙ্গে চলুন।'

'না। আমি এখন খাব। আমার খিদে পেয়েছে।'

'ওঃ।' বলে অর্জুন সোজা কিচেনে চলে গিয়ে আলো জ্বাললেন। সন্ধ্যাবেলায় রান্না করে রাখা খাবারগুলো মাইক্রোওভেনে গরম করে ডাকলেন, 'আসুন।'

স্বপ্না সাড়া দিল না।

খাবার প্লেটে ঢালার সময় অর্জুনের খিদেটা চাগাড় দিল। নিজের জন্যেও খাবার নিল সে। তারপর সামনে তাকিয়ে দেখল স্বপ্না তখনও বসার ঘরেই রয়ে গেছে।

'দয়া করে এগুলো খেয়ে আমাকে উদ্ধার করুন।' বেশ জোরে কথাগুলো বলেই থমকে গেলেন অর্জুন। কোন মানুষ একা একা এত জোরে কথা বলেন! প্রতিবেশীরা অবশ্য এখন যে যার ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমাচ্ছে তবু ব্যাপারটা খেয়ালে রাখা উচিত ছিল তাঁর।

'স্বপ্না!' চাপা গলায় ডাকল অর্জুন।

এবার স্বপ্নাকে দেখতে পেলেন। ঘরের দরজায় এসে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, হাতে গ্লাস।

'খেয়ে নিন।'

'আমি খাব না।'

'খাবেন না?'

'খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'গ্লাসটাকে রেখে সোজা ওপরে চলে যান।'

আদেশ পালন করার চেষ্টা করল স্বপ্না। টলতে টলতে কোনও মতে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারল। ওর পায়ে যে শক্তি নেই, তা বুঝতে অসুবিধে হল না। অর্জুন চুপচাপ দেখছিলেন।

স্বপ্না ওপরে ওঠার জন্যে পা বাড়াল। হাত বাড়িয়ে সিঁড়ির হাতল ধরতে

চাইল। কিন্তু সেটা খুঁজে না পেয়ে ঘুরে কাটা কলাগাছের মতো কার্পেটের ওপর লুটিয়ে পড়ল। পড়ে স্থির হয়ে গেল।

মেয়েরা মাতাল হলে কুৎসিত দেখায়। স্বপ্না কতখানি হুইস্কি খেয়েছে, তা অর্জুনের জানা নেই কিন্তু এই মুহূর্তে ওর দিকে তাকাতে তাঁর ইচ্ছে করছিল না। চুপচাপ রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে প্লেট ধুয়ে, বের করা খাবার ফ্রিজে ঢুকিয়ে আলো নেভালেন।

স্বপ্নার কাছে গিয়ে ভাবলেন, থাক পড়ে এখানে। নেশা ছুটে গেলে নিজেই ওপরে উঠে যাবে। তার পরেই মনে প্রশ্ন এল, চোট পায়নি তো পড়ার সময়? তিনি ঝুঁকে ডাকলেন, 'স্বপ্না! স্বপ্না!'

স্বপ্নার মাথা ঈষৎ নড়ল। যেন বিরক্ত হল সে।

এখানে রাত্রে ঠান্ডা বাড়ে। নিজে লেপের আরামে ঘুমাবেন আর এই মেয়েটা যতই মাতাল হোক, এভাবে পড়ে থাকবে? তিনি স্বপ্নাকে তোলার চেষ্টা করলেন। স্বপ্না দীর্ঘাঙ্গী, শরীরও রুগ্‌ণ নয়, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই দুই হাতে ওর শরীরটাকে তুলে কোনও মতে দোতলায় উঠে এলেন অর্জুন।

কনুই দিয়ে দরজা ঠেলে খুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে লেপটা আনতে গেলেন খাটের কোণ থেকে। পাশ ফিরে শুয়েছিল স্বপ্না। ওর শরীরের ওপর লেপ বিছিয়ে দিতে গিয়ে বুকের বাতাস স্থির হল অর্জুনের। রাত্রিবাস উঠে গেছে প্রায় উরুসন্ধির কাছাকাছি। উর্ধ্বাঙ্গ অবশ্য আবৃত। কিন্তু নিম্নাঙ্গের গড়নে যে এমন আকর্ষণ থাকে, তা তাঁর জানা ছিল না। খুব ইচ্ছে করছিল হাঁটুর ওপরের অংশ স্পর্শ করতে। বুঝতে পারছিলেন ওখানে সিল্কের স্পর্শ আছে।

রাত্রে ঘুম এল না অনেকক্ষণ। সংযমের রাশ টেনে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসার পর অদ্ভুত শূন্যতা যেন তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল। নারীর সান্নিধ্য তাঁর খারাপ লাগে না কিন্তু তার জন্যে কখনওই তিনি লালায়িত ছিলেন না। জীবনে প্রেম এসেছিল বাইশ বছর বয়সে। কিন্তু সেই প্রেমকে স্বীকৃতি দেওয়ার যোগ্যতা সেই বয়সে অর্জন করেননি বলে সরে আসতে হয়েছিল। কিন্তু সেই নারীকে ভুলতে পারেননি কখনও। এই না ভুলতে পারাটাই দ্বিতীয় নারীকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেতে বাধা তৈরি করেছিল। আমেরিকায় এসে প্রথম দশ বছর চাকরি করেছেন। তারপর পরামর্শদাতা হিসেবে মোটামুটি

ভালই রোজগার করছেন। যে-সব বাঙালি পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, তারা এদেশে এসেছে চাকরি করতে। বেশিরভাগই স্বামী-স্ত্রী। সেইসব স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ যে তাঁর প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখাননি তা নয়, কিন্তু সেটা না বোঝার ভান করে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এদেশে একলা বাঙালি মেয়ের সংখ্যা খুবই কম এবং থাকলেও তাঁরা কখনওই অর্জুনকে আকর্ষণ করেননি। অবাঙালি, বিশেষ করে সাদা চামড়ার মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা মারা যায় কিন্তু তাদের সঙ্গে সারাজীবন বাস করা যায় না বলে অর্জুনের ধারণা। আজ হঠাৎই স্বপ্নার শরীর দেখে তাঁর যাবতীয় ভাবনা টলমল হয়ে যাচ্ছিল।

দরজায় শব্দ হতেই ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের। তাঁর ঘরের দরজায় কখনও কেউ শব্দ করেনি। ভুল শুনেছেন ভেবে ঘড়ি দেখলেন তিনি। আটটা বাজে। তড়াক করে উঠতে গিয়েও থেমে গেলেন অর্জুন। আজ তাঁর কাজ বেলা বারোটায়। প্রচুর সময় আছে। আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার আনন্দ তিনি পেতেই পারেন!

আবার শব্দ হতেই অর্জুনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'কে?'

দরজা খুলল স্বপ্না, 'আপনার চা কি এখানে দিয়ে যাব?'

উঠে বসলেন অর্জুন, 'ও। চা বানিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি নীচে যাচ্ছি, তিন মিনিট।'

'আসুন।' স্বপ্না সরে গেল দরজা থেকে।

দাঁতে ব্রাশ বোলাতে বোলাতে অর্জুন ভেবে নিলেন। স্বপ্নাকে চলে যেতে হবে। প্রথমবার তিনি নিজেকে সংযত রাখতে পেরেছেন কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি নিজের কাছেই হেরে যান! তা ছাড়া চলে যাওয়ার কথা তিনি গতকালই ওকে বলে দিয়েছেন। কিন্তু একটা কথা তাঁকে স্বীকার করতেই হবে, মেয়েটার শরীর সত্যি সুন্দর। পৃথিবীর সব মেয়েদের না-দেখা শরীর কি ওইরকম সুন্দর হয়?

নীচে নেমে অর্জুন দেখলেন স্বপ্না কাপে চা ঢালছে।

'আপনি নিশ্চয়ই চিনি দুধ ছাড়া চা খান?' স্বপ্না তাকাল।

'কেন?'

'যে-কোনও মানুষের তাই খাওয়া উচিত যদি সে চায়ের স্বাদ পেতে চায়।'

'আমার চিনি লাগবে। দেড় চামচ।'

স্বপ্নার এগিয়ে দেওয়া কাপ টেনে নিয়ে অর্জুন চেয়ারে বসলেন, 'সুপ্রভাত।'

'সরি। আমি সুপ্রভাত বলতে পারছি না।' স্বপ্না চায়ে চুমুক দিল।

'কেন?'

'আমি সাজিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারি না। আমার আজকের দিনটা যখন অনিশ্চিত তখন প্রভাতটাকে ভাল বলব কেমন করে!' স্বপ্না তাকাল।

'অনিশ্চিত মানে?'

'আপনি আমাকে আজ সকালেই এখান থেকে চলে যেতে বলেছেন।'

মাথা নাড়লেন অর্জুন, 'আমাকে একটা কথা বলুন। এভাবে কেউ অচেনা দেশে আসে? আপনি বলেছেন আপনার সম্বলও বেশি নেই। কী সাহসে আপনি এই উদ্যোগ নিলেন?'

'আপনি আমাকে একটা নিরাপদ হোটেলে যদি পৌঁছে দেন তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।' স্বপ্না বলল।

'তারপর?'

'দেখা যাক। নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

হঠাৎ মৃণাল বসুর কথা মনে এল অর্জুনের। চাকরি করার সময় ওর সঙ্গে যে-ঘনিষ্ঠতা ছিল, তা এখনও রয়েছে। মৃণালের প্রচুর জানাশোনা। ওর ভাবী স্ত্রী বলে ও ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পছন্দ করে।

'আপনি কোনও ওয়ানরুম ফ্ল্যাটে অথবা পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতে চান?'

'যদি আমার সামর্থে কুলায়—!'

চা শেষ করে অর্জুন ফোন করলেন মৃণালকে। সে তখন গাড়িতে, অফিস যাচ্ছে। বলল, 'নো প্রবলেম দাদা, বল।'

'একজন বাঙালি মহিলার জন্যে পেয়িং গেস্ট অথবা ওয়ানরুম ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?' অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন।

'বয়স কত?'

দূরে বসা স্বপ্নার দিকে আর একবার তাকিয়ে অর্জুন বললেন, 'অ্যারাউন্ড ছাব্বিশ।'

'ম্যারেড?'

'না।'

'তাহলে পেয়িং গেস্ট হবে না। আমার পরিচিত এক স্বামী-স্ত্রী পেয়িং গেস্ট

খুঁজছে। হয় কিশোরী নয় বিবাহিতা। অবিবাহিতা যুবতীকে ভদ্রমহিলা অ্যালাউ করবেন না। খুব দরকার?'

'হ্যাঁ।'

'যদি কোন অবসেশন না থাকে তাহলে সিঁথিতে একটু সিঁদুর লাগিয়ে নিতে বল, হয়ে যাবে।'

'অসম্ভব।'

'অ। দুটো দিন টাইম দাও। সাড়ে সাতশোর মধ্যে একটা ওয়ানরুম ফ্ল্যাট হয়ে যেতে পারে। আমি তোমাকে ফোন করব। বাই।'

রিসিভার নামিয়ে অর্জুন কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন। মৃণাল যখন বলেছে তখন ওটা জোগাড় হয়ে যাবে। কিন্তু এই দু'দিনের জন্যে হোটেলে থাকতে বলা কি ঠিক হবে! চায়ের কাপ ধুয়ে রেখে এগিয়ে এল স্বপ্না, 'আপনি কখন বেরবেন?'

'ন'টার মধ্যে। শুনুন, আপনি যদি বিবাহিতা হতেন, তাহলে আজই পেয়িং গেস্ট হিসেবে জায়গা পেয়ে যেতেন। একটা ওয়ানরুম ফ্ল্যাট পাওয়া যাবে দিন দুয়েকের মধ্যে। এই দুটো দিন আপনি যদি হোটেলে গিয়ে থাকতে চান, পারেন, যদি এখানে থেকে যেতে চান আমার আপত্তি নেই।'

'এটা তো আপনার ওপরই নির্ভর করছে।'

'মানে?'

'আমার তো পছন্দ-অপছন্দের কোনও অধিকার নেই।'

'বেশ। কাল রাত্রে কিস্যু খাননি। একটু পরে ভালভাবে ব্রেকফাস্ট করে নেবেন।' অর্জুন সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

'একটা কথা বলব?'

অর্জুন দাঁড়ালেন।

'কাল সারাদিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলাম। হয়তো এতদূরে প্লেনে আসার জন্যে কাহিল ছিলাম। কিন্তু আজ সারাদিন দরজা-জানলা বন্ধ করে ভূতের মতো এই বাড়িতে বসে থাকলে দম বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি যদি আমাকে যাওয়ার পথে কোথাও ছেড়ে দেন তাহলে ভাল হয়। যে সময় ফিরবেন তা বলে দিলে আমি অপেক্ষা করব।' স্বপ্না বলল।

'বেশ। তৈরি হয়ে নিন।'

সকাল সাড়ে-আটটার পর এই পাড়াটা ফাঁকা হয়ে যায়। অফিসে যাদের যাওয়ার কথা তারা বেরিয়ে যায়। বার্গলার অ্যালার্ম লাগানো বন্ধ দরজার ওপাশে বাড়িগুলো নিঝুম হয়ে থাকে। তবু সাবধানের মার নেই বলে অর্জুন আগে বেরিয়ে গাড়িটার ইঞ্জিন চালু করে দরজার কাছে আসলেন যাতে স্বপ্না চটপট উঠে বসতে পারে। সে উঠে এলে অর্জুন গাড়ি থেকে নেমে দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে চারপাশে তাকিয়ে নিলেন। না, কারও অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না।

ক্লোস্টার শহরের উপান্তে একটা রঙিন বাগান-রেস্তোরাঁ আছে। তার পার্কিং-এ গাড়ি ঢুকিয়ে অর্জুন বললেন, 'আসুন।'

'এখানে?'

'কিছু খেয়ে নিই। বড্ড খিদে পেয়েছে।'

রঙিন ছাতার নীচে সুদৃশ্য টেবিল চেয়ার। সেখানে স্বপ্নাকে বসিয়ে অর্জুন চলে গেলেন খাবার আনতে। ফিরে এলেন একটা ট্রেতে চিকেন ওমলেট আর স্যান্ডউইচ নিয়ে। বললেন, 'শুরু করুন।'

'এখানে আমার সঙ্গে আপনাকে দেখলে কোনও অসুবিধে হবে না?'

'না।' অর্জুন খাওয়া শুরু করলেন, 'বাড়িওয়ালির সঙ্গে শর্ত একমাত্র প্রেমিকা ছাড়া অন্য মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এখন এখানে কোনও বাঙালি পয়সা খরচ করে খেতে আসবে না। এলেও যদি আমাকে চিনতে পারে তাহলে ভাববে ভাইঝি অথবা ভাগ্নির সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করছি।'

'আমি আপনার ভাইঝি?'

'দেখলে তাই মনে করবে ওরা। বয়স তাই মনে করাবে।'

'মোটেও না।'

'তর্ক করে লাভ নেই। খেয়ে নিন।'

'না। তর্ক করছি না। শুধু একটু শুধরে দিচ্ছি, আমি ভাইঝি হতে পারি, কিন্তু আপনি আমার কাকা নন।' হাসল স্বপ্না।

'তাহলে?'

'একশো ভাগ জ্যেঠা।' মুখ নামাল স্বপ্না।

পুলিশ স্টেশনের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সেলফোনের নাম্বার টিপলেন অর্জুন, 'হ্যালো। অর্জুন দত্ত বলছি। আপনি কোথায়?'

অহনার গলা শোনা গেল, 'মেয়েকে স্কুলে পৌঁছাতে যাচ্ছি।'

'ও। আপনি সত্যি চাইছেন আমি পুলিশকে অফিসিয়ালি জানাই?'

'প্লিজ।'

'মেয়েকে স্কুলে পৌঁছাবার পর আপনি কোথায় থাকবেন তা যদি জানতে পারি—?'

'আমি অফিসে থাকব।'

'যদি দরকার হয় তাহলে দেখা করব। বাই।' ফোন অফ করে দরজা খুললেন অর্জুন, 'চলুন। ভেতরে যেতে হবে।'

'এটা তো, এটা নিশ্চয়ই থানা।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনার ভয় পাওয়ার কারণ নেই।'

নিজের পরিচয়পত্র দিয়ে ডিউটি অফিসারকে বিস্তারিত বললেন অর্জুন।

ভদ্রলোক কম্পিউটারের বোতাম টিপে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে বললেন, 'ঘটনা ঘটার এত পরে রিপোর্ট করতে এসেছেন কেন?'

'সেইসময় স্পটে যে-অফিসার ছিলেন, তিনি ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব না দেওয়ায় ভেবেছিলাম এ নিয়ে আপনাদের বিব্রত করার দরকার নেই। কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সেটা শুনতে চাইছে না।'

ডিউটি অফিসার হাসলেন, 'কিন্তু আপনি যে-স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন, তাতে তো ওরা আরও সুবিধে পেয়ে যাবে। আপনার গাড়ির ক্ষতি হয়েছে?'

'হ্যাঁ। গ্যারাজে সারাতে দিয়েছি।'

'তাহলে আপনি বলুন যে, আপনার গাড়ি রেডলাইটের জন্যে দাঁড়িয়েছিল আর তখনই পেছন থেকে ওই ভদ্রমহিলার গাড়ি এসে ধাক্কা দিয়েছে। ভদ্রমহিলার বেল্ট পরা ছিল। বেল্ট কাজ করেনি বলে তিনিও ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন। ইনফ্যাক্ট আমাদের সহকর্মী সেইরকম রিপোর্ট দিয়েছে।'

'কথাটা সত্যি নয় অফিসার। আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল না। রেডলাইট দেখে আমি ইতস্তত করে গাড়ি ব্যাক করেছিলাম বলেই ধাক্কাটা লাগে।'

'ওকে।' ডিউটি অফিসার কম্পিউটার থেকে স্টেটমেন্ট করে বললেন, 'এখানে সই করুন। ঠিকানাটা দিয়ে দেবেন প্লিজ, সেই সঙ্গে গাড়ির নাম্বার।'

কাজটা হয়ে গেলে রিপোর্টের একটা কপি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'উইশ ইউ গুড লাক। হ্যাভ এ নাইস ডে।'

বাইরে বেরিয়ে এসে স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। সামান্য।'

'আপনি দোষটা নিজের ঘাড়ে নিলেন কেন? যিনি ধাক্কা দিয়েছেন তিনি কি আপনার পরিচিত?'

হাসলেন অর্জুন, 'পরিচিতরাই শুধু ধাক্কা দেয়, এটা ভাবছেন কেন?'

স্বপ্না তাকাল। গম্ভীর মুখে গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন অর্জুন দত্ত।

সে বলল, 'আমি কি এখানেই অপেক্ষা করব?'

'কার জন্যে?' অর্জুন দরজা খুললেন।

'বাঃ। কথা হল, আপনি সময় বলে দিলে আমি একটা জায়গায় অপেক্ষা করব সেখানে এসে আপনি ফেরার সময় আমাকে গাড়িতে নিয়ে যাবেন।'

'অ। না, এখানে নয়। উঠুন।'

স্বপ্না উঠে বসলে অর্জুন সেলফোনে কিছুক্ষণ কথা বলে নিলেন। স্বপ্না বুঝতে পারল, উনি কারও ঠিকানা জেনে নিচ্ছেন।

আধঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে নামলেন অর্জুন, 'নামুন।'

যে-বাড়িটায় ওরা ঢুকল সেটা যে অফিস-বাড়ি, তা বুঝতে অসুবিধে হল না। তিনতলার একটি ঘরের দরজায় লেখা আছে এ এল এন্টারপ্রাইজ। দরজা বন্ধ। নক করলেন অর্জুন। একটি প্রৌঢ় দরজা খুলে তাদের দেখে বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন?'

'মিসেস অহনা আমিন আছেন? আমি অর্জুন দত্ত।'

'আসুন।'

ঘরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে দ্বিতীয় ঘরের দরজায় গিয়ে প্রৌঢ় বললেন, 'আপা অর্জুন দত্ত এসেছেন।'

'নিয়ে আসুন।' অহনার গলা শুনতে পেলেন অর্জুন।

অহনা ওদের সাদরে বসালেন। অর্জুন বললেন, 'প্রথমেই ক্ষমা চাইছি, একটু অসভ্যের মতো চলে যেতে হবে বলে। আমার একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারব না। হ্যাঁ, আমি থানায় গিয়েছিলাম। এই হল রিপোর্টের কপি। আপনি দয়া করে পড়ে আমার মেলে পাঠিয়ে দিলে খুশি হব।'

নিজের মেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিলেন অর্জুন।

'যা ঘটেছিল তাই বলেছেন তো?' অহনা জিজ্ঞাসা করল।

'কোনও ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তার ব্যাখ্যা সবসময় একরকম হয় না।

ওঃ, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, ইনি অহনা আর এঁর নাম স্বপ্না।'

অহনা মাথা নাড়লেন, 'আপনি—!'

'স্বপ্না নিউইয়র্কে এসেছেন দু'দিন আগে। কাজের সন্ধানে। ওঁর কোনও থাকার জায়গা ছিল না। ঘটনাচক্রে আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। না হলে বিপদে পড়তেন। দু'দিন বাদে একটা অল্প ভাড়ার ফ্ল্যাট পাবেন। তখন স্বাবলম্বী হতে পারবেন বলে আশা করি। আচ্ছা, চলি। উঠুন স্বপ্না।'

'এক মিনিট। আপনি বললেন যে খুব জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্টে যাচ্ছেন। সেটা কি ওঁর জন্যে?' অহনা জিজ্ঞাসা করল।'

'না না। আমি ওঁকে কোথাও নামিয়ে দেব। উনি সারাদিন ঘুরে বেড়াবেন। বিকেলে ফেরার সময় আমি তুলে নিয়ে যাব।'

'সর্বনাশ। এই অজানা শহরে উনি সারাদিন কোথায় ঘুরবেন?'

স্বপ্নার দিকে তাকাল অহনা, 'আপনি আমার এখানে থাকতে পারেন। আমার পার্টনার এখন দেশে গিয়েছে, কাজের চাপ নেই বললেই হয়। মিস্টার দত্ত বাড়ি ফেরার সময় ফোনে যোগাযোগ করে নেবেন।'

'বাঃ। খুব ভাল হল। আমি চলি।' অর্জুন বেশ ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

অহনা জিজ্ঞাসা করলেন, 'চা চলবে?'

'না। এইমাত্র খেয়ে এসেছি।' স্বপ্না বলল।

'কলকাতায় থাকেন?'

'হ্যাঁ। আপনি?'

'ঢাকায় থাকতাম।'

'অনেক বছর এখানে আছেন?'

'হ্যাঁ। প্রায় সতেরো বছর।'

'বাব্বা! আপনাদের কীসের ব্যবসা?'

'গারমেন্টসের। দেশ থেকে এনে এখানে সাপ্লাই দিই।'

'বাঃ।'

'খুব ভাল নয়। কম্পিটিশন খুব। তা ছাড়া টাকার অভাব। ক্যাপিটাল বেশি থাকলে লাভ বেশি হত। আপনি চাকরির সন্ধানে এসেছেন না চাকরি নিয়ে?'

'সন্ধানে।'

'ভিসা পেলেন কী করে?'

অহনা দেখল, স্বপ্না হাসল কিন্তু কিছু বলল না।

চাকরি চাই বললে ইউএস কনস্যুলেট কিছুতেই ভিসা দেবে না। কোনও সিঙ্গল মহিলা ট্যুরিস্ট ভিসা পেতে পারেন না। নয় এগারোর পরে এ-ব্যাপারে আরও বেশি কড়াকড়ি হয়েছে। তা সত্ত্বেও মহিলা যখন এদেশে এসেছেন তখন বোঝাই যাচ্ছে পেছনে কোনও রহস্য আছে।

'আপনি কোথায় থাকেন?' স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল।

'কাছেই। একটা বাড়ি আছে। তার দুটো তলা ভাড়া দিয়ে কিছু পাই। আর এই ব্যবসা।' অহনা বলল।

'আপনার ওখানে ঘর খালি নেই?'

'না। ফ্ল্যাট ছিল। ভাড়া হয়ে গেছে।' অহনা বলল, 'দোতলায় আমি আর আমার মেয়ে থাকি।'

'আপনার মেয়ে? কত বড়?'

'কিছুদিন পরেই কলেজে যাবে।'

'সে কী? আপনাকে দেখে ভাবাই যায় না যে অত বড় মেয়ে আছে!'

'যাঃ। আমারও তো বয়স কম হল না।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক এলেন একটা ফাইল নিয়ে। সেটা নিয়ে অহনা কিছু কাজের কথা বলতে লাগল। স্বপ্না ঘরটাকে দেখল। বেশ ছিমছাম। এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে অর্জুন দত্তের সম্পর্ক কী? উনি মেয়েকে নিয়ে থাকেন বললেন। স্বামী কোথায় থাকে? বিধবা নাকি ডিভোর্সি?

প্রৌঢ় চলে গেলে অহনা বলল, 'আমার আজকের কাজ শেষ। চলুন, সারাদিন ঘরে বসে না থেকে একটু ঘোরা যাক।'

স্বপ্না খুশি হল। চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না তার।

ঘণ্টা দেড়েক নিউইয়র্কের রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি নিয়ে ঘুরে স্বপ্নাকে শহরটা চেনাতে চেষ্টা করল অহনা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'খিদে পেয়েছে?'

'এখনও পায়নি।'

'ভাত খাবেন? কাল আমি অনেক রেঁধে রেখেছি।'

'আপনারা একবার রান্না করে ক'দিন ধরে খান?'

'যতক্ষণ না খাবারটা নষ্ট হয়ে যায়।' হাসল অহনা, 'আমি দু'দিন।'

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই রবার্ট এগিয়ে এল। দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমার কী করা উচিত?'

অহনা অবাক হয়ে বলল, 'কেন? কী হয়েছে?'

'আমার সামনে এমন সুন্দরী দুই নারী অথচ তাদের সামনে নতজানু হয়ে ফুল দিতে পারছি না। এপাড়ায় আজ একটাও ফুল ফোটেনি, বোধ হয় ওরা জানত, তোমরা দু'জনে এক সঙ্গে আসবে।' দু'বার মাথা সামনে ঝোঁকাল রবার্ট, 'অবশ্য সব কিছুর একটা ভাল দিক আছে। ফুল থাকলে আমি কাকে আগে দিতাম? মিলিয়ন ডলার সমস্যা। সেই সমস্যায় আমাকে পড়তে হল না। হাই মিস, আমার নাম রবার্ট, তুমি বব বলে ডাকতে পার। আমি তোমার বান্ধবীর একমাত্র বয়ফ্রেন্ড।

ততক্ষণে ওরা গাড়ি থেকে নেমে এসেছে। স্বপ্না প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল, এখন মজা পেল। লোকটার বয়স কত সে বুঝতে পারছে না, তবে সত্তরের নীচে তো নয়। পরনে বারমুডা আর জ্যাকেট। মুখটা হাসি হাসি, সাদা চুলে কদম ছাঁট।

অহনা বলল, 'না, এবার তোমার বউকে ব্যাপারটা জানাতেই হয়।'

'প্লিজ, কবে জানাবে?'

'মানে?'

'জানালেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। আর তাড়িয়ে দিলে আমি তোমার কাছে চলে আসব। এই যে খুকি, তোমার নাম কী?'

'স্বপ্না।'

'নামটার মানে কী?'

'ছাড়ো তো!' অহনা ধমক দিল, 'একবার শুরু করলে আর থামবে না। যাচ্চলে! আমি তুমি বলে ফেললাম।'

'এখন থেকে তুমিই হোক।'

অহনা বাড়ির দরজা খুলতেই জনসন এগিয়ে এল ভেতর থেকে।

'তুমি আজ কাজে যাওনি?'

বিশাল চেহারার জনসন কথা না বলে হাসল। তারপর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। রবার্ট বিমর্ষমুখে দাঁড়িয়ে থাকল ফুটপাতে।

ওপরে উঠে অহনা বলল, 'এই আমার বাড়ি। দোতলাটায় আমি আর আমাব মেয়ে থাকি। এক আর তিন তলায় ভাড়াটে।'

'ওই কালো লোকটা তোমার ভাড়াটে?' স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। ওর নাম জনসন। একা থাকে।'

'তোমার ভয় লাগে না?'

'ভয়?' হেসে ফেলল অহনা, 'ও খুব ভাল মানুষ। ধর্মবিশ্বাসী। ওর প্রেমিকা ওকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আর কোনও মেয়ের সঙ্গে মেশেনি। মুখ বুজে কাজ করে যায়। আমার বাড়ির যে-কোনও সারাই-এর প্রয়োজন হলে জনসনকে ডাকি, ও ঠিক কাজটা করে দেয়। ভয় দূরের কথা, ওর ওপর অনেকটা নির্ভর করি আমি।'

'আমার তো দেখামাত্র বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠেছিল।'

'কালো আর বিশাল চেহারা বলে? বেশির ভাগ কালোরাই এখন ভীতিকর কিন্তু জনসন ব্যতিক্রম। বোসো।'

'আর ওই লোকটা? রবার্ট?'

'মজার মানুষ। আশির ওপরে বয়স কিন্তু সব সময় হাসিখুশি।'

'আশি? আমি ভাবতেই পারছি না।' বসে পড়ল স্বপ্না।

'রবার্ট ভাবতেই চায় না যে ওর বয়স হয়েছে। ঘুম থেকে উঠে পাড়ায় টোটো করে ঘোরে, গাড়ি চালিয়ে লোকের উপকার করে। খিদে পেলে বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসে। দেশে ওই বয়সের কোনও মানুষ এরকম জীবন যাপন করছেন, ভাবতেই পারি না। আমি তো ওর নাতনির বয়সি, কিন্তু ওঁকে দাদু বলে ভাবতে পারি না।' অহনা বলল।

'ওর বউ—!'

'খুব ভাল মহিলা। কিন্তু বাড়ি থেকে বের হন না। বয়স হয়েছে তো!'

হেসে ফেলল স্বপ্না, 'বরের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি বয়স নয়।'

খাওয়া-দাওয়ার পরে অহনা জিজ্ঞাসা করল, 'এবার বল তো, এত দুঃসাহস দেখিয়ে এদেশে এলে কেন?'

'একটা জেদ ছিল। তাই।'

'ও। জেদটা পূর্ণ করলে কী ভাবে?

স্বপ্না একটুও ইতস্তত না করে যা ঘটেছিল তা শোনাল। অহনা বলল, 'সর্বনাশ। ভদ্রলোক যদি ডিভোর্স না দিতেন?'

'দিত। টাকাটা ওর কাছে অনেক মূল্যবান। কিন্তু অর্জুন দত্ত বললেন, যে-স্বামীর সঙ্গে আমার আইনত বিচ্ছেদ হয়ে গেছে তাঁর স্ত্রী হিসেবে এদেশে ভিসা নিয়ে আসাটা বেআইনি ব্যাপার হয়েছে। আমার মাথায় সেটা আগে ঢোকেনি।' স্বপ্না বলল।

'ঠিক। জানতে পারলে ওরা তোমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবে।'

'কী করে জানবে?'

'কেউ না জানিয়ে দিলে জানবে না। এখানে কে কে জানে?'

'অর্জুন দত্ত, আপনি আর আমার প্রাক্তন স্বামী।'

শুনে হেসে ফেলল অহনা, 'তুমি ওঁকে অর্জুন দত্ত বলে ডাক?'

'ডাকার সময় বলি না, তোমাকে বোঝাবার জন্যে বললাম।'

'হুঁ। এখন কী করবে?'

'ঘরটা পেয়ে গেলে দু'মাস চেষ্টা করব চাকরি খোঁজার। ততদিন চালাবার মতো ডলার সঙ্গে আছে। তার পর কী হবে জানি না।'

'তুমি এতদূর পড়াশুনা করেছ, কারও সঙ্গে ভালবাসা হয়নি?'

'হলে এভাবে কি আসতে পারতাম? আসলে কাউকেই মন থেকে নিইনি।'

ফোন বাজল। স্বপ্না দেখল ফোনে ইংরেজি বলার সময় অহনার ভঙ্গিটাই বদলে গেল। ওর ইংরেজি উচ্চারণ নিশ্চয়ই এ দেশীয়দের মতো। ফোন রেখে দিয়ে অহনা বলল, 'একেবারে ওঠ ছুঁড়ি, তোর বিয়ে।'

'মানে?'

'আমার ওপরের তলাটা ভাড়া নিতে চেয়েছিল একজন পুলিশ অফিসার। কথা বলে গিয়েছিল। এখন ফোন করে বলল, আজই পজেশন নিলে আমার আপত্তি আছে কিনা। ঘরগুলো ঠিকঠাক আছে, তাই আসতে বলে দিলাম। ভালই হল, আজ থেকেই ভাড়া দেবে ওরা।' হাসল অহনা।

'তোমার ভাড়ার টাকায় সংসার চলে যায়?'

'ভাড়ার টাকা বাড়ি কেনার ইনস্টলমেন্ট মেটাতেই শেষ হয়ে যায়। আচ্ছা, তুমি তো অর্জুন দত্তের বাড়িতে আছ। আর কেউ থাকেন ওখানে?'

'না। ভদ্রলোক অবিবাহিত। কিন্তু বাড়ি চমৎকার সাজিয়ে রেখেছেন। আমাকে প্রায় চোরের মতো থাকতে হয়। কেউ যেন না বুঝতে পারে আমি ওই বাড়িতে আছি, এই শর্তে উনি থাকতে দিয়েছেন।' স্বপ্না হাসল।

'ওমা, কেন?'

'হয়তো ওঁর বদনাম হয়ে যাবে। এখানেও এসব আছে?'

'খুব আছে। তুমি তোমার প্রেমিকের সঙ্গে থাকলে কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু তুমি যদি রোজ পুরুষ পালটাও তাহলে তোমার নামে পুলিশের কাছে নালিশ যাবে এই বলে যে, তুমি বাড়িতে ব্যবসা করছ। পুলিশ এসে

জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রমাণ না পেয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু তুমি তখন ওই পাড়ায় থাকতে পারবে না।'

'বাব্বা!'

'মিস্টার দত্তের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে তোমার অস্বস্তি হচ্ছে না?'

'না। প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছিল মানুষটা অন্য রকম। আমার ধারণা যে ঠিক তা প্রমাণিত হয়েছে।'

'তুমি যদি ওর দেখা না পেতে—!'

'কী হত তা নিয়ে আমি ভাবতে রাজি নই, কী হবে তাই ভাবছি।'

ঘড়ি দেখল অহনা। বলল, 'আমি একটু বেরুব। মেয়ের স্কুল ছুটি হওয়ার সময় হয়েছে। ওকে নিয়ে আসতে হবে।'

'কতদূরে?'

'কাছেই। তুমি ইচ্ছে করলে একটু বিশ্রাম করে নিতে পার।'

'তার চেয়ে আমিও যাই তোমার সঙ্গে!'

'যাবে না। তুমি থাকলে আমার উপকার হয়। মিস্টার জোন্সরা এসে যদি বেল বাজান তাহলে ব্যালকনিতে গিয়ে ওদের পরিচয় জেনে দরজা খুলে দিয়ো। তিনতলার ফ্ল্যাটের চাবিটা এখানে আছে। অবশ্য আমি তার আগেই ফিরে আসব বলে মনে হয়। তুমি আমার সঙ্গে গেলে আর ওরা চলে এল, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকল, সেটা ভাল দেখাবে না।'

অহনা চলে গেল। মেয়েটাকে যত দেখছিল তত মুগ্ধ হচ্ছিল স্বপ্না। কিন্তু তাকে কখনও দ্যাখেনি, পরিচয় জানে না অথচ তার ওপর বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল অহনা? শুধু অর্জুন দত্তের মাধ্যমে পরিচয় হয়েছে বলে। অর্জুন দত্তের সঙ্গেও তো দু'দিনের আলাপ। বোধহয় লড়াই করা মেয়েরা বুঝতে পারে কাকে গ্রহণ করবে, কাকে না।

সোফায় শরীর এলিয়ে দিল স্বপ্না। একলা থাকতে তার মোটেই ভয় লাগবে না কিন্তু দু'মাসেও যদি কোনও হিল্লে না হয়! হতেই হবে। যেমন করে হোক। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলল স্বপ্না, জড়ানো গলায় অদ্ভুত ধরনের ইংরেজি বলল একটা নারী কণ্ঠ। বলে হেসে লাইন কেটে দিল। কথাগুলোর মানে বুঝতে চেষ্টা করেও পারল না স্বপ্না। এই একটা অসুবিধে তার হবে। এদের উচ্চারণ বুঝতে না পারলে চাকরি করবে কী করে! সোফায় ফিরে এল স্বপ্না।

মিনিট দশেক পরে বেল বাজতেই সে উঠে চারপাশে তাকাতেই দ্বিতীয়বার বেল বাজল। রাস্তার দিকের দরজা খুলতেই ছোট্ট ব্যালকনিটা চোখে পড়ল। গণেশের মূর্তিও। অহনার উপাধি যখন আমিন তখন ও নিশ্চয়ই হিন্দু নয়। তাহলে গণেশের মূর্তি কেন?

সে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে নীচে তাকাতেই জিনস পরা এক মহিলাকে ওপরের দিকে মুখ করে হাসতে দেখল, 'আই অ্যাম মিসেস জোন্স।'

জড়ানো গলা হলেও এবার বুঝতে পারল স্বপ্না। তার মনে হল, এই গলাই একটু আগে টেলিফোনে কথা বলেছে। সে মাথা নেড়ে ভেতরে চলে এল।

দু'-দুটো ভারী স্যুটকেস নিয়ে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির মেমসাহেব তিনতলায় উঠে গেলেন স্বপ্নাকে অবাক করে। দরজা খোলার পর বলেছিলেন, 'আমার স্বামী সন্ধেবেলায় আসবে। আমরা তিনতলাটা ভাড়া নিয়েছি। আমি মিসেস জোন্স।'

স্বপ্না দ্রুত বাংলা থেকে ইংরেজিতে তর্জমা করে বলেছিল, 'আমি জানি। যিনি বাড়ির মালিক, তিনি একটু পরে আসবেন। আপনি যদি তিনতলায় যেতে চান, তা হলে দরজা খুলে দিতে পারি।'

ভদ্রমহিলার মাথা দু'দিকে দুলে উঠেছিল, ঠোঁট বন্ধ মুখের হাসিতে ফুটেছিল নির্বাণ-নির্বাণ ভাব।

দরজা খুলে দিতেই মহিলা স্যুটকেস দুটো ভেতরে নিয়ে গেলেন, 'নো ফার্নিচার, নো কট। টম উইল অ্যারেঞ্জ এভরিথিং।'

'বাই।' বলে নেমে এসেছিল স্বপ্না। কলকাতায় কোনও বাঙালি মেয়ে স্বামীকে সঙ্গে না নিয়ে প্রথমবার ভাড়া বাড়ির দখল নিতে যাবে ওইরকম স্যুটকেস হাতে? হয়তো যাবে, সময় তো দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

অহনার ফোন এল। ওর আসতে দেরি হবে। মেয়ের ব্যাপারে ওর ক্লাস টিচার কথা বলতে চাইছেন। স্বপ্না বলল মিসেস জোন্সের আগমনের কথা।

'একাই এসেছে? অদ্ভুত তো। ভাড়া নিচ্ছেন মিস্টার জোন্স, তিনি সইটই করাব আগে তাঁর বউ স্যুটকেস নিয়ে ঢুকে গেল? সমস্যাটা একদম মাথায় আসেনি, নইলে তোমায় বলে আসতাম। ঠিক আছে।' ফোন রেখে দিল অহনা।

মিনিট দশেক বাদে দোতলার দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ হল। সদর দরজা বন্ধ

বলে বাইরের লোক দোতলায় আসতে পারে না। ওই জনসন নয় তো! অহনা যাই বলুক, লোকটা যদি তাকে ধরে তা হলে কিস্যু করতে পারবে না সে।

ভয়ে ভয়ে দরজা খুলল স্বপ্না। খুলে চমকে গেল।

মিসেস জোন্স দাঁড়িয়ে আছেন মুখে সেই স্বর্গীয় হাসি নিয়ে। মাথা দুলছে। এখন তাঁর পরনে একটা খাটো বারমুডা আর সরু স্ট্র্যাপের গেঞ্জি।

'মে আই—।' বলে ঘরের ভেতরটা দেখলেন মিসেস জোন্স।

নতুন ভাড়াটে হয়তো কিছু বলতে এসেছে, স্বপ্না সরে দাঁড়াল। মহিলা ভেতরে ঢুকলে দরজা বন্ধ করে শুনল, 'লট অফ ফার্নিচার। কী সুন্দর। আমার ফ্ল্যাটে কোনও ফার্নিচার নেই!' শ্বাস ফেললেন বেশ শব্দ করে, 'আচ্ছা, তুমি কে?'

'আমি?' এক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে স্বপ্না বলল, 'অহনার পরিচিত।'

'অ-অ-না। হু ইজ শি?'

'আপনার বাড়িওয়ালি।'

'আই সি। অনা! গুড নেম, তোমার নাম কী?'

'স্বপ্না।'

'স্ব প্না অ্যান্ড অনা।' বলে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়লেন মহিলা, 'মাই নেম-মার্টিনা। মাই গ্র্যান্ডমাদার ইউজড টু কল মি, মার্টিনা।'

চোখ সরিয়ে নিল স্বপ্না। মহিলা সামান্য ঝুঁকলেই ওর সরু স্ট্র্যাপের গেঞ্জি উপচে স্তন বেরিয়ে আসছে অনেকটা। তাতে ওর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। গেঞ্জির প্রান্ত শেষ হয়েছে নাভির ওপর। নাভিতে দুটো রিং বসানো। চুল ছেলেদের মতো ছাঁটা হলেও ফুলে ফেঁপে আছে।

'আমার কাছে একটাও ডলার নেই। যা ছিল ট্যাক্সির ভাড়া দিতেই শেষ হয়ে গেছে। টম আসবে সন্ধের সময়। ততক্ষণ অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি কি আমাকে কুড়িটা ডলার ধার দিতে পারবে? প্লিজ! টম এলেই ওটা ফেরত পেয়ে যাবে তুমি!' গেঞ্জি ওপরে টেনে শরীর ঠিক করতে করতে কথাগুলো বলল মার্টিনা।

হাঁ হয়ে গেল স্বপ্না। তারপর দ্রুত ব্যাগ খুলে দুটো দশ ডলারের নোট মহিলার হাতে দিল। শূন্যে চুমু খেলেন মহিলা। কিন্তু তাতে তৃপ্তি না হওয়ায় দু'হাতে স্বপ্নাকে জড়িয়ে ধরে গালে সশব্দে চুমু খেয়ে বললেন, 'ইউ আর বিউটিফুল।'

একটা কড়া কটু গন্ধ ধ্বক করে নাকে এল স্বপ্নার। দ্রুত মুখ সরিয়ে নিল সে। এই প্রথম কোনও মানুষ তার গালে এইভাবে ঠোঁট ঘষল। এটা এমন বিরক্তিকর এবং তার ওপর ওই কটু গন্ধ, শরীর গুলিয়ে উঠল স্বপ্নার। মনে হচ্ছিল বমি হয়ে যাবে। ততক্ষণে মহিলা নীচে নেমে গিয়েছেন। টয়লেটের চারপাশে তাকাল স্বপ্না। তারপর আন্দাজে ফ্ল্যাটের অন্যদিকটায় চলে এসে একটা দরজা খুলতেই আবছা টয়লেট চোখে পড়ল। বেসিনে মুখ নামাতে হড় হড় করে বমি হয়ে গেল তার। জোরে শ্বাস নিল সে। না, দ্বিতীয়বার হল না। কল খুলে কুলকুচি করে, মুখে ঘাড়ে জল দেওয়ার পর একটু আরাম লাগতে আলো জ্বালল। দুপুরের খাবারগুলো বীভৎস চেহারায় ছড়িয়ে আছে বেসিনের ওপর। সেগুলো জলে ধুয়ে বেসিন পরিষ্কার করে আয়নায় নিজেকে দেখতেই গালে লেগে থাকা লিপস্টিকের রং যেন ক্যাটক্যাট করে উঠল। জলে মুখ ধুয়েছিল কিন্তু তাতে রং সরেনি। বাঁদিকে সাজিয়ে রাখা ছোট ছোট রঙিন তোয়ালের মধ্যে থেকে লাল তোয়ালে তুলে অনেকক্ষণ ধরে ঘষার পর রঙমুক্ত হল স্বপ্না। কিন্তু তবু, কটু গন্ধটা কিছুতেই যাচ্ছিল না।

তৃণাকে নিয়ে অহনা ফিরে এল প্রায় সাড়ে পাঁচটায়। তখনও বাইরে রোদ্দুর। তাকে দেখে তৃণা বলল, 'হাই! আমি তৃণা।'

স্বপ্না খুব খুশি হল মেয়েটাকে দেখে। বেশ সুন্দর, নির্মেদ, হিলহিলে শরীর। বলল, 'আমি স্বপ্না। তুমি স্বপ্না মাসি বলতে পার।'

'মাসি! ওঃ, নো। তুমি স্বপ্না আন্টি।'

অহনা বলল, 'যাও, জামাকাপড় ছেড়ে এসো। খেয়ে নাও।' তার পর স্বপ্নাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওর স্বামী নিশ্চয়ই আসেনি?'

পুরো ঘটনাটা বলল স্বপ্না।

'মাই গড! তুমি কুড়ি টাকা দিলে কেন? চেনা নেই জানা নেই, চাইল আর দিয়ে দিলে! এই মেয়ে নিশ্চয়ই ড্রাগ বা গাঁজা খায়।'

'অ্যাঁ!' হকচকিয়ে গেল স্বপ্না।

'ওসব কেনার জন্যে তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেল।'

হেসে ফেলল স্বপ্না, 'তুমিও টাকা বলছ!'

'ও।'

'মহিলা বলেছেন ওঁর স্বামী এলে শোধ করে দেবেন।'

'কিন্তু স্বামী না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না কেন? খাচ্ছিলাম

তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল এঁড়ে গরু কিনে। এরকম ভাড়াটে রাখা তো যাবে না।' পকেট থেকে সেলফোন বের করে বোতাম টিপল অহনা, 'হ্যালো, রবার্ট! তুমি কোথায়? একটু বাড়ির সামনে এসো।'

চটপট ব্যালকনিতে চলে গেল অহনা। পেছনে স্বপ্না। দূরে রবার্ট তার গাড়ি মুছছিল। হাত নেড়ে ইশারায় জানাল, সে আসছে, তার পর ধীরে সুস্থে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলল, 'ইয়েস সুইটহার্ট।'

'আমি জোন্সদের বাড়ি ভাড়া দিতে চাই না।'

'সে কী!'

'মহিলা, মিসেস জোন্স একাই স্যুটকেস নিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছেন। কোনও চুক্তি সই হয়নি, ভাড়ার টাকা দেননি। তার ওপর, আমি বাড়িতে ছিলাম না, ওর কাছ থেকে কুড়ি ডলার ধার করে গেছেন।'

'আহা, বেচারা বোধ হয় খাবার কিনতে গেছে।'

'তোমার মুন্ডু। ও নির্ঘাৎ ড্রাগ কিনতে গেছে।'

'ড্রাগ? মাই গড। এখানে কোথায় ড্রাগ পাওয়া যায় তুমি জান?'

'না।'

'তাহলে ও জানবে কী করে? ওরকম বে-আইনি জিনিস লোকে দোকানে সাজিয়ে নিশ্চয়ই রাখে না। রেগে গেলে তোমার মাথা ঠিক থাকে না।' রবার্ট বলল।

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে চাইলেই ওসব পাওয়া যায়?'

'যারা খায় তারা ঠিক হদিশ জানে।'

'আমাদের ভুলও তো হতে পারে।'

'তাহলে বিশ্রী গন্ধটা পেলে কী করে? রবার্ট ড্রাগ খেলে মুখে গন্ধ হয়?'

মাথা নাড়ল রবার্ট, 'নো। কখনও নয়। আমার এক বন্ধু ড্রাগ খেত। কোনও গন্ধ কখনও আমরা পাইনি।'

তবু অহনা মানতে পারল না, 'একটা কিছু নেশা করে, নাহলে প্রথমবার এবাড়িতে পা দিয়েই তোমার কাছে টাকা ধার করে বাইরে ছুটবে কেন?'

রবার্ট কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে তিনতলাটা দেখল, 'তুমি বলছ ও বাইরে গিয়েছে অথচ ওপরের ঘরে তো আলো জ্বলছে!'

'আলো? দিনদুপুরে আলো জ্বলছে?' অহনা ক্ষেপে গেল।

'এখন দিন-দুপুর নয়। শীতকাল হলে রাত হয়ে যেত। ছ'টা বাজে। ঘরের

ভেতর আলো না জ্বালিয়ে পড়া যায় না। তা ছাড়া ওদের তো আলাদা ইলেকট্রিক মিটার। তুমি কেন উত্তেজিত হচ্ছ ডার্লিং!' রবার্ট বলল, 'দরজাটা খোলো। আমি গিয়ে দেখে আসছি।'

চাবি ফেলে দিল অহনা। রবার্ট বলল, 'বোধহয় ভেতরে কেউ নেই।'

'আমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে, আনব?'

রবার্ট বলল, 'সেটা কি ঠিক হবে! তুমিও চল আমার সঙ্গে।'

নক করতে ঘরের ভেতর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। কেউ খুব বিরক্ত হয়েছে বোঝা গেল। রবার্ট বলল, 'হাই! দিস ইজ রবার্ট।'

একটু পরে দরজা খুলে গেল। মিসেস জোন্স দরজা ধরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে তাঁর অনবদ্য হাসি হাসলেন, 'ও ডিয়ার! আই অ্যাম স্লিপিং। ওকে! কাম ইনসাইড।

ঘরে ঢুকে অহনা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার শরীর ঠিক আছে?'

মাথা নাড়লেন মিসেস জোন্স, 'আই অ্যাম ফাইন।'

মহিলার দিকে তাকাতে লজ্জা লাগছিল অহনার। গেঞ্জি গুটিয়ে গেছে। স্তনের অনেকটাই দৃশ্যমান। সে চাপা গলায় রবার্টকে বলল, 'ওর দিকে তাকাবে না।'

রবার্ট মাথা নাড়ল, 'তুমি কোপেনহেগেনে গেলে মারমেড দেখবে না! ধরে নাও ও এখন তাই।' বলে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল, 'মিসেস জোন্স, তুমি খুব সুন্দরী। কিন্তু কিছু একটা খেয়েছ, যার ফলে তোমার সৌন্দর্য বেড়ে গেছে।'

হাসলেন মিসেস জোন্স। তার পর ঘরের প্রান্তে গিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়লেন দেওয়ালে হেলান দিয়ে, 'নো ফার্নিচার। ইউ নো, আই লাভ মাই হাজব্যান্ড। আমি কখনও তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। ও একজন পুলিশ অফিসার, যে কখনও ফার্নিচার কেনে না।' হঠাৎ চোখ মুখ পালটে গেল মহিলার। মনে হচ্ছিল যে কোনও মুহূর্তে কেঁদে ফেলবেন।

রবার্ট তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ওকে! ওকে! ইউ স্লিপ।'

'নো। উনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন তখন বলেই ফেলি। আমি কখনও আমার স্বামীকে ছেড়ে যাব না। আমাদের বিয়ে হয়েছে বহুদিন হয়ে গেল। ও সারাদিন ডিউটি করে আর সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আমার শরীরের যে প্রয়োজন আছে, তা খেয়ালই করে না। জোর করলে শুরু হতে না হতে শেষ হয়ে যায় ওর। আমার তখন কান্না ছাড়া কোনও অবলম্বন

থাকে না। আমার ঠাকুমা মুখ বুজে সহ্য করে যেত। আমার মা ডিভোর্স করে আবার বিয়ে করেছিল। আমি কিন্তু ওকে ছাড়তে পারব না। তাই তামাক খাই। ঘাস। তোমরা যাকে গাঁজা বল।' হাসলেন মহিলা, 'খেলে আমি অন্য একটা পৃথিবীতে চলে যাই। আমার স্বামীর ওপর একটুও রাগ থাকে না। বেশ শান্তি পাই।'

অহনা বলল, 'ঠিক আছে। আপনি বিশ্রাম নিন।'

স্বপ্না দেখল অহনার মুখে একটা নরম ছাপ পড়েছে।

সন্ধের মুখে অর্জুন দত্তের ফোন এল। দেরির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে জানতে চাইলেন স্বপ্না এখন কোথায় আছেন। অহনা বলল, 'আমার এখানে।'

ঠিকানাটা আবার জেনে নিয়ে অর্জুন বললেন, 'ওঁকে তৈরি থাকতে বলুন, আমি মিনিট কুড়ির মধ্যে পৌঁছাচ্ছি।'

ফোন রেখে অহনা বললেন, 'যাক, তোমার চিন্তা দূর হল। অর্জুন দত্ত আসছেন।'

'আশ্চর্য! আমি চিন্তা করব কেন? জলে তো পড়ে নেই!' স্বপ্না প্রতিবাদ করল। তারপর একটু অন্যরকম গলায় বলল, 'তোমার এখানে থাকতে পারলে বেশ হত।'

'আমারও ভাল লাগত। কথা বলার সঙ্গী পেতাম। দেখছ তো, কী জীবনযাপন করি। সেই ভোর থেকে রাত্রে শুতে না যাওয়া পর্যন্ত একা সমস্যার ঢেউ সামলাতে হয়। মেয়েটা ভাল জায়গায় ভরতি হলে একটু হালকা হব।'

'ও তোমার কাছে থাকবে না?'

'না।'

'ওইটুকু মেয়ে, একা থাকবে?'

'ওইটুকু মেয়ে কী বলছ? আমাদের দেশে একসময় চোদ্দো বছরের মেয়ে মা হয়ে যেত। ওর ক্লাসের মেয়েদের কেউ কেউ অ্যাবর্শন করিয়েছে এর মধ্যেই।'

'সেকী।' চমকে উঠল স্বপ্না।

'সব সময় সেই ভয়ে থাকি। একবার পড়ার জন্যে বাড়ি ছাড়লে মেয়ে আর পাকাপাকি থাকার জন্যে বাড়িতে ফিরবে না। না ফিরুক, কিন্তু ভুলের ফাঁদে যেন পা না দেয় তাই সব সময় প্রার্থনা করি।'

'ওর বাবা—?'

'আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে অনেকদিন। তবে বাবা তার মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। আমি এত করি কিন্তু বাবার ফোন পেলে মেয়ের উচ্ছ্বাস বেড়ে যায়।' অহনা বলল, 'আমার দোতলায় শোওয়ার ঘর দুটো। বাইরের কাউকে তাই থাকতে বলতে পারি না।'

স্বপ্না মাথা নাড়ল, 'না, না। আর তো দু'দিন। তারপরে একটা ওয়ানরুম ফ্ল্যাট পেয়ে যাব। তোমার কাছে কিন্তু মাঝে মাঝে আসব। এই আমেরিকায় তুমি যেভাবে আছ তা দেখে আমার খুব ভাল লাগছে। আচ্ছা, মিস্টার জোন্স তো এখনও এলেন না!'

ওরা কথা বলছিল ব্যালকনিতে বসে। স্বপ্নার কথা শেষ হতেই একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল সামনে। অহনা বলল, 'অর্জুন দত্ত এসে গেছেন।'

গাড়ি থেকে নেমে অর্জুন বললেন, 'বাঃ। চমৎকার! কিন্তু আজ ওপরে উঠব না। আর একদিন, অবশ্য যদি অনুমতি দেন, এসে চা খেয়ে যাব।'

'আপনি কি চান আমার মেয়ে সারাজীবন অবিবাহিত থাকুক?' অহনা হাসল।

'মানে?'

'কিছু না খেয়ে চলে গেলে শুনেছি বাড়ির মেয়ের বিয়ে হয় না।'

মাথা নেড়ে হাসলেন অর্জুন। অহনা দরজা খোলার জন্যে নীচে নেমে গেল। স্বপ্না ব্যালকনি থেকে ভেতরে এসে চারপাশে তাকাল। এখন নিজেকে উদ্বাস্তু বলে মনে হলেও বছর খানেকের মধ্যে সে কি একটা ফ্ল্যাট সাজিয়ে নিতে পারবে না?

দরজা খুলে অহনা বলল, 'আসুন।'

'এক কাপ কফি! একটু তাড়াতাড়ি।' ভেতরে ঢুকে বললেন অর্জুন।

ওপরে উঠে অর্জুন বললেন, 'বাঃ। সুন্দর। এই যে, কেমন কাটল দিন?'

স্বপ্না মাথা নাড়ল, 'দারুণ।'

'আরে, আমি সেই নিউজার্সি থেকে ফিরে এলাম।'

'মানে?' অহনা জিজ্ঞাসা করল।

'প্রতিদিন যেমন ফিরে যাই, আজও সেই রকম ফিরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, আরে! স্বপ্না দেবীকে তো নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল! একা ফেরার অভ্যেস তো, মনেই ছিল না। গাড়ি ঘুরিয়ে আবার এলাম।'

হাসতে হাসতে কিচেনে ঢুকে অহনা বলল, 'আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক। অমন সুন্দরী মহিলার কথা ভুলে গেলেন! তার ওপর দু'দিন ধরে যাঁর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করছেন! স্বপ্না, সাবধান!'

স্বপ্না গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি ওঁর আশ্রিতা। মনে পড়ার পর যে নিতে এসেছেন, তাতেই আমি কৃতজ্ঞ।'

অর্জুন বললেন, 'বাঃ। চমৎকার।'

'আমার জন্যে আপনার অসুবিধে হচ্ছে। আমাকে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে, কাউকে বলতে পারছেন না। অবশ্য কী-ই বা বলার ছিল—একটি অচেনা অজানা মিথ্যেবাদী মেয়েকে এয়ারপোর্ট থেকে কুড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছি—এতে আপনার সম্মান একটুও বাড়ত না। ওঁর অফিসে কী করে নিয়ে গেলেন তা জানি না।' স্বপ্না বলল।

অর্জুন বললেন, 'ওঁকে যেটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে উনি শিষ্টাচারে বিশ্বাস করেন। তা ছাড়া উনি পশ্চিমবাংলা থেকে আসেননি। এদেশে পশ্চিমবাংলা আর বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে মেলামেশা খুব কম। ফলে উনি ভুল বুঝতে সাহায্য করবেন না।'

কফি তৈরি করে টেবিলে রেখে অহনা বলল, 'আসুন। সবাই মিলে কফি পান করি। আপনার গাড়িকে জখম করার পরও যখন আপনি আমার বিরুদ্ধে মামলা করেননি, তখন আপনার এই কফিটা পাওনা ছিল।'

স্বপ্না হাসল, 'এ তো একেবারে শেষের কবিতার মতো ব্যাপার।'

অর্জুন আপত্তি করলেন, 'না না। শেষের কবিতা নয়। আমি কখনওই হে বন্ধু বিদায় বলতে রাজি নই।'

কফিতে চুমুক দিয়ে অহনা বলল, 'স্বপ্নার এখানে থাকতে ইচ্ছে। আপনার আপত্তি আছে।'

'বিন্দুমাত্র নয়।' মাথা নাড়ল অর্জুন।

'উনি তাতে বেঁচে যাবেন।' স্বপ্না বলল।

'হ্যাঁ। এখন তো মরে আছি। তাহলে ওঁর জিনিসপত্র—?'

'ও যদি ফ্ল্যাট পায় আলাদা কথা।'

'অবশ্যই।' মনে পড়ে গেল অর্জুনের, 'ও একটা কথা। আপনার কপালটা বোধ হয় ভাল। একটা পার্ট টাইম কাজ খালি আছে। করবেন?'

স্বপ্না বলল, 'কী রকম?'

'ইন্টারপ্রেটারের। হাসপাতালে যেসব বাংলাদেশি পেশেন্ট ভরতি হন তাদের অনেকেই ইংরেজি জানেন না। ডাক্তারকে বোঝাতে পারেন না, তাঁদের অসুবিধে কী। সেটা ওঁদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিয়ে ডাক্তারকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। দিনে বড়জোর ঘণ্টা চারেকের কাজ। একশো ডলার পাবেন প্রত্যেকদিনে। আপনার দিব্যি চলে যাবে।' অর্জুন বললেন।

'নিশ্চয়ই করব। কী করতে হবে বলুন।' স্বপ্না বলল।

'মাথা খারাপ হয়ে যাবে তোমার!' অহনা বলল, 'সিলেটি অথবা চাকমা পেশেন্ট পেলে দেখবে ওদের কথার একবর্ণ বুঝতে পারছ না।'

'ওরা বাঙালি নয়?' স্বপ্না অবাক।

'নিশ্চয়ই। সিলেট কত বাঙালি প্রতিভার জন্ম দিয়েছে।'

'তাহলে আমি ম্যানেজ করে নেবই।' স্বপ্না জোর দিয়ে বলল।

'শুধু একটাই সমস্যা। আপনার ওয়ার্কিং পারমিট নেই। ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে এসেছেন। এদেশে ট্যুরিস্ট হয়ে এলে চাকরি করা বে-আইনি। খবরটা যিনি দিয়েছেন, তাঁকে সমস্যাটার কথা বলেছি। তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আগামিকাল জানাবেন।'

অর্জুন দত্তের কথা শুনে সব উৎসাহ চলে গেল স্বপ্নার। 'তা হলে ঘর ভাড়া নিয়ে থেকেও আমি চাকরি পাব না?'

'ভাল চাকরি পাবেন না। অড জব করতে পারেন। রেস্টুরেন্টে, দোকানে। যাদের ওয়ার্কিং ভিসা নেই, তাদের ওরা অর্ধেক টাকা দিয়ে কাজে নেয়।'

অহনা হাসল, 'পাকিস্তানিরা কী করে জান? ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে এদেশে এসে পাসপোর্ট ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে কমোডে ফেলে ফ্ল্যাশ টেনে দিয়ে থানায় গিয়ে বলে ওটা পকেটমার হয়ে গেছে। তার পর সেই ডায়েরির কপি নিয়ে নিজেদের দূতাবাসে গিয়ে বলে ডুপ্লিকেট দিতে। তারা দেশ থেকে খবর না আনিয়ে নতুন পাসপোর্ট দেবে না। অ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে কপিতে ছাপ মেরে দেয়। এবার ওইসব কাগজ নিয়ে ইউ এস ইমিগ্রেশনে গিয়ে লাইন দেয়। দেশ থেকে পাসপোর্টের অনুমতি না আসা পর্যন্ত তাকে সাময়িকভাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হোক, নইলে না খেয়ে মরতে হবে। এরা সেটা দিয়েও দেয়। ওই অনুমতি পেয়ে গেলেই কাজে ঢুকে যেতে অসুবিধে নেই।'

'দেশ থেকে অনুমতি তো আসবেই। তখন?'

হাসল অহনা, 'সাধারণত আসে না। এলেও, যার জন্যে আসে, সে খোঁজ

নেয় না। আগে খুব বেশি হত। এখন কম্পিউটারের জন্যে ইচ্ছে করলেই চটজলদি খবর পাওয়া যায়। কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনে যদি ভুল তথ্য দেওয়া হয় তাহলে কম্পিউটার কী করবে।' কফি শেষ করে অর্জুন দত্ত বললেন, 'এসব মতলব মাথায় রাখবেন না। এসব করে এখন সহজে পার পাওয়া যায় না।'

অহনা ওঁদের গাড়িতে তুলে দিতে এল। তখনই মিস্টার জোন্সের গাড়ি বাড়ির সামনে থামল। স্বপ্না বলল, 'ইনিই স্বামী?'

অহনা মাথা নাড়ল।

গাড়ি চালাতে চালাতে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু খাওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে কাল আমি যখন সকালে বেরুব, আপনি তৈরি থাকবেন। এই বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাব।' অর্জুন রাস্তা দেখতে দেখতে বললেন।

'আপনারা যেমন বলবেন!'

'মানে?'

'আমার তো স্বাধীনতা নেই। আপনার ওপর নির্ভর করে আছি, এখানে এলে অহনার ওপর নির্ভর করতে হবে।' স্বপ্না মুখ ঘোরাল।

অর্জুন দত্ত কিছুক্ষণ কথা বললেন না। হাডসন নদী পেরিয়ে যাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করতে পারি?'

উত্তর দিল না স্বপ্না। বাইরে তাকিয়েই রইল।

'সলিল রায়ের সঙ্গে নোটিস দিয়ে সইসাবুদ করে বিয়ে করেছিলেন। নিশ্চয়ই ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এবং সাক্ষীদের সামনে?'

'নিশ্চয়ই।'

'ডিভোর্সটা কী ভাবে হল?'

'উনি টাকা নিয়ে মিউচুয়াল ডিভোর্স অ্যাপ্লিকেশনে সই করে এসেছিলেন।'

'সেই ব্যাপারে কোর্টে গিয়ে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন?'

'না। তখন উনি আমেরিকায় চলে এসেছেন।'

'তার পর?'

'বেশ কয়েকটা ডেট দেওয়ার পর ডিভোর্সের অর্ডার হয়েছিল।'

'কোন কোর্টে হয়েছিল, তা কি উনি জানেন?'

'বোধ হয় না।'

'অর্ডারের কপি?'

'উনি পাননি। খবরও নেননি। এ-ব্যাপারে কোনও ইন্টারেস্ট ছিল বলে মনে হয় না। কোর্ট থেকে ওর ঠিকানায় চিঠি যেত আর ফিরে আসত।'

'ডিভোর্সের অর্ডার যে বেরিয়ে গিয়েছে, তা কি উনি জানেন?'

'আমি যখন ফোন করেছিলাম তখন জানতে চেয়েছিলেন। আমি অর্ধেক সত্যি বলেছিলাম। বলেছিলাম, যে-কোনও দিন অর্ডার পেয়ে যাব।'

'কেন?'

'ডিভোর্সের অর্ডার বেরিয়ে গেছে শুনলে যদি স্পনসর করতে না চান!'

'বাঃ। জ্ঞান তো দেখছি টনটনে। তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, সলিল রায় জানেন না কোর্ট অর্ডার দিয়ে দিয়েছে।'

'আমার তো তাই মনে হয়।' স্বপ্না তাকাল, 'কিন্তু এসব কথা উঠছে কেন? উনি আর কোনও অর্থেই আমার স্বামী নন।'

'ঠিকই। কিন্তু এদেশে আইনসংগতভাবে থেকে চাকরি করার পথ পরিষ্কার করতে আপনাকে আপাতত বিবাহিতা হয়ে থাকতে হবে।' অর্জুন বললেন।

'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

একটা নির্জন জায়গা দেখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অর্জুন ঘুরে বসলেন, 'আপনি এদেশে এসেছেন সলিল রায়ের স্ত্রীর পরিচয় নিয়ে। এয়ারপোর্টেও সেটা রেকর্ডেড হয়ে আছে। আপনার স্বামী আপনাকে রিসিভ করতে যাননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন আপনি তাঁর হদিশ পেলেন, তখন দেখলেন তিনি অন্য মহিলার সঙ্গে বাস করছেন। এর ফলে আপনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং বিবাহমুক্ত হতে চাইছেন। এদেশের কোর্টে যদি আবেদন করেন এবং সলিল রায় যদি আপত্তি না জানান তাহলে রায় আপনার পক্ষে যাবে। আপনার পক্ষে দেশে ফিরে মুখ দেখানো সম্ভব নয় বলে বেঁচে থাকার জন্যে ওয়ার্ক পারমিট চাইতে পারেন। ওই পরিস্থিতি আপনাকে পারমিট পেতে খুব সাহায্য করবে।'

'আমি তো ইন্ডিয়ান, এখানে মামলা করতে পারব?'

'দেখা যাক। তবে তার আগে আপনাকে সলিল রায়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'কেন?'

'এদেশের কোর্টে মিউচুয়ালে ডিভোর্স ফাইল করতে উনি রাজি হবেন

কিনা। না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ভাববেন, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে আপনাকে। আপনি যদি সেটা না ক্লেম করেন তাহলে মত বদলাতেও পারেন।'

'কিন্তু অলরেডি আদালত ডির্ভোস তো গ্র্যান্ট করেছে।'

'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ!'

আবার গাড়ি চালালেন অর্জুন দত্ত। অন্ধকার নেমে গেছে অনেকক্ষণ। হঠাৎ টুপটাপ বৃষ্টি শুরু হল। অর্জুন বলল, 'হয়ে গেল। আজ বেশ ঢালবে।'

'কী করে বুঝলেন?'

'অভিজ্ঞতায়।'

সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল স্বপ্না। তার ওপর অর্জুন দত্ত মাথায় যে-চিন্তাটা ঢুকিয়ে দিল, সেটা যেন আরও ভার বাড়িয়ে দিল। বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে। তবু স্নান না করে পারল না সে। পাজামার ওপর ছোট পাঞ্জাবি পরে সে নীচে নামল। রাতের রান্না সে করবে বলে কিচেনে ঢুকল। ফ্রিজ খুলে দেখল ভাত অনেকখানি রয়েছে। তরকারি বলতে কয়েকটা আলু আর পেঁয়াজ। কিন্তু কাঁচা চিকেন রয়েছে অনেকটা। সেটা বের করে বাইরে রাখতেই অর্জুন নেমে এলেন পোশাক বদলে।

'আপনি রাঁধছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু মুরগির মাংস ছাড়া আপনার সংসারে কিছু নেই।'

'বাজারে যেতে হবে। এই বৃষ্টিতে মুরগিই হোক।' বলে হাসলেন অর্জুন, 'শস্তায় পাওয়া যায় বলে আনি। এককালে মুরগি শুনলে জিভে জল আসত, আর এখন গায়ে জ্বর আসে।'

'তাহলে গাড়ি নিয়ে গেলেই তো হয়।'

'দূর। আপনার শীত করছে? গরম চালাব?'

'না-না। ঠিক আছে।'

অর্জুন চলে গেলেন বাইরের ঘরে। কেউ একজন তার জন্যে এই বাড়িতে রেঁধে দিচ্ছে, ভাবতেই ভাল লাগল। বেশির ভাগ দিন তো কেনা খাবার গরম করে খেয়ে রাত কাটাতে হয়। হুইস্কির বোতল আর বরফ নিয়ে বসলেন অর্জুন।

সলিল রায়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার। লোকটাও স্বামীত্ব স্বীকার করতে চায়নি। ক্ষতিপূরণ না দিতে হলে মিউচুয়ালে রাজি হবে না কেন? রাজি না

হলে যদি শোনে স্বপ্না ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করবে, তাহলে কী করতে পারে? দেশে গিয়ে খোঁজ নেবে, তাদের ডিভোর্স ইতিমধ্যে হয়ে গেছে কিনা? কী করে জানতে পারবে সেটা? কোন কোর্ট, কোন তারিখ, এগুলো নিশ্চয়ই ওর জানা নেই। তা ছাড়া ডিভোর্সের দরখাস্তে সই করার পরেও ও নিশ্চয়ই এখান থেকে নোটারি পাবলিককে দিয়ে সই করিয়ে স্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ভিসার জন্যে। সেটাও তো অপরাধ। তাই শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে যাবে বলেই মনে হল অর্জুনের। একমাত্র সেটা হলে স্বপ্না পায়ের তলায় মাটি পাবে। এদেশে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে থাকতে এসে ডিভোর্স করে অনেক মেয়েই তো থেকে গেছে। তারা চাকরিও করছে। এই ব্যাপারে মৃণাল বসু ভাল বলতে পারবে।

মৃণালকে ফোন করল অর্জুন, 'মৃণাল, কিছু এগোল?'

'কাল বলতে পারব দাদা। ভদ্রমহিলার কি এখন থাকার জায়গা নেই? আই মিন, খুব অসুবিধে হচ্ছে?'

'স্বস্তিতে নেই বলতে পারি।'

'আমি দেখছি।'

'আচ্ছা, আর একটা কথা। দেশে বিয়ে করে এসে কোনও মেয়ে যদি বাধ্য হয় এদেশের কোর্টে ডিভোর্স নিতে, তাকে ইমিগ্রেশন কী ভাবে দ্যাখে।'

'আইনটা আমি ভাল জানি না। তবে আমার পরিচিতা একটি মেয়ে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে স্বামীর কাছে থাকতে এসে টরচার্ড হয়েছিল। মেয়েটি শেষ পর্যন্ত অন্যের সাহায্য নিয়ে ডিভোর্স কেস করে পেয়ে যায়। এখন তো আবার বিয়ে করে এদেশে বেশ ভালই আছে। কেন বলুন তো?' মৃণাল জিজ্ঞাসা করল।

'পরে বলব। গুড নাইট।'

আচমকা শীত শীত বোধ হল অর্জুনের। অনেকটা হুইস্কি পেটে চালান করে দিয়ে মনে হল হয় শালটা নিয়ে আসতে হবে নয় গরম করার মেশিন চালু করা দরকার। কিন্তু হুইস্কির কল্যাণে শীতবোধটা চলে গেল তাঁর।

'নিন।'

চমকে তাকালেন অর্জুন। একটা প্লেটে কয়েক পিস আলু ডিম দিয়ে ভেজে নিয়ে এসেছে স্বপ্না। 'একটু ডিম খুঁজে পেয়ে গেলাম। সারা দিনে কী খেয়েছেন জানি না, এখন এগুলো মুখে দিলে খারাপ লাগবে না।'

একটা পিস মুখে পুরে অর্জুন বলল, 'বাঃ। একে কী বলে জানেন?'

'না। মাথায় যা এল তাই বানালাম।'

'চাঁট। গ্র্যান্ড।' বলে চোখ ছোট করলেন, 'ঠান্ডা লাগছে? একটা সোয়েটার কিংবা চাদর—!'

'থাক।'

'তার পর জ্বর এলে?'

'জ্বর এলেও কাল ঠিক চলে যাব।' স্বপ্না চলে গেল কিচেনে। হঠাৎ নিজেকে কীরকম অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল অর্জুনের। সেই সময় ফোন বাজল। রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই মিসেস ম্যাকফারসনে গলা শুনতে পেল, 'হাই ডাটা। আমার অভিনন্দন নাও। আমি খুব খুশি হয়েছি।'

'আপনি খুশি হয়েছেন শুনে খুব ভাল লাগছে। কিন্তু কেন তা বুঝতে পারছি না।

'তোমার প্রতিবেশী মিসেস স্কটের সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় দেখা হয়েছিল। তাঁর মুখেই খবরটা শুনলাম। মেয়েটিকে সিগারেট খেতে দেখেছেন উনি। জানলা খোলা ছিল। তা ছাড়া আজ সকালে তোমরা একসঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ। এতগুলো বছর তুমি প্রেম ছাড়া কী করে কাটালে জানি না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমার জীবনে প্রেম এল!'

'মিসেস ম্যাকফারসন—।'

'ও ডিয়ার! লজ্জা পাওয়ার কোনও কারণ নেই। তোমাকে বলেছিলাম, কোনও বান্ধবীকে বাড়িতে নিয়ে যেয়ো না একমাত্র প্রেমিকা ছাড়া। তুমি সেটা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছ। আজ যখন তোমার বাড়িতে একজন এসেছে সে তো প্রেমিকা ছাড়া কিছু হতে পারে না। উইশ ইউ গুড লাক।' বৃদ্ধা লাইন কেটে দিলেন।

ফোন নামিয়ে অন্যমনস্ক অর্জুন অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলেন।

'একী! খাচ্ছেন না?'

স্বপ্নার কথায় হুঁশ এল। দুটো হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে স্বপ্না দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুন বললেন, 'বসুন।'

ডিভানের একপাশে বসে স্বপ্না বললেন, 'এবার ঠান্ডা লাগছে। বৃষ্টি কখন যে থামবে।'

'এখানে বৃষ্টি থামলেই ঠান্ডা বেড়ে যায়।' অর্জুন বললেন, 'ওখান থেকে একটা গ্লাস আনুন, একটু খান, আরাম পাবেন। অথবা ওপরে চলে গিয়ে গরম

জামা পরুন। পছন্দ আপনার। আমি এখন একটু ডিস্টার্বড।'

'কেন?'

'বাড়িওয়ালি ফোন করেছিলেন। আমাকে অভিনন্দন জানালেন।'

'অভিনন্দন?'

'হ্যাঁ। প্রতিবেশিনী তাঁকে জানিয়েছেন, এই বাড়িতে মহিলা আছেন। শর্ত অনুযায়ী আমি প্রেমিকা ছাড়া কোনও মহিলাকে নিয়ে আসতে পারব না। কখনও কাউকে আনিনি। তাই অভিনন্দন জানিয়েছেন।'

'ইস্!' শব্দটা ছিটকে এল স্বপ্নার মুখ থেকে।

'ভদ্রমহিলা খুব ভাল। এর পরে নিশ্চয়ই আলাপ করিয়ে দিতে বলবেন।'

'আমি তো কালই চলে যাচ্ছি। বলবেন, চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেছে।'

'সেরকম কিছু বলতে হবে। তার পর জানাতে হবে সম্পর্ক ভেঙে গেছে।'

'কেন?'

'নইলে সত্যি যদি কাউকে আনার দরকার হয় তাহলে—!'

'এখন কেউ আছেন?'

'নেই। কিন্তু আসতেও তো পারেন।'

'ঠিক।' স্বপ্না উঠে গ্লাস নিয়ে অর্জুনের সামনে রাখল।

তিন টুকরো বরফ মিশিয়ে গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'গ্লাস ওপরে তুলুন। বলুন, আনন্দ।'

'আনন্দ। আচ্ছা, চিয়ার্স শব্দটার মানে কি আনন্দ?'

হাসলেন অর্জুন, 'নো। উল্লাস কাছাকাছি যায়। কিন্তু আমরা আনন্দিত হতে চাই।'

স্বপ্না সন্তর্পণে চুমুক দিল। না, কোনও ঝাঁঝ নেই। বেশ মোলায়েম গন্ধ। কিন্তু গলা দিয়ে নামার সময় একটা গরম হলকা শরীরে ছড়িয়ে দিল। ফলে শীত শীত ভাবটা একটু কমে গেল। সে চটপট বাকিটা গলায় ঢালল। বরফ পড়ে থাকল গ্লাসে। চোখ বন্ধ করল। এবার আর তার শীত করছিল না।

অর্জুন বললেন, 'আপনাকে আর খেতে হবে না।'

'কেন?'

'এভাবে খেলে আপনি মাতাল হয়ে যেতে বাধ্য। সভ্যতা মানুষকে শিখিয়েছে মদকে উপভোগ করতে কিন্তু মাতাল না হতে। এখানকার কোনও পার্টিতে কেউ মাতাল হয়ে গেলে তাকে আর কেউ নেমন্তন্ন করে না।'

'ঠিক আছে। এবার আচার খাওয়ার মতো খাব।'

'আচার খাওয়ার মতো?' হেসে ফেললেন অর্জুন, 'তাই খান।'

রাত বাড়ছিল। বাড়ছিল বৃষ্টির তেজ। অর্জুন বললেন, 'আপনার ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবছি। ওই সলিল রায়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'আপনি যা ভাল মনে করেন, তাই করুন।'

কয়েক সেকেন্ড ভেবে সেলফোনটা তুলে নিলেন অর্জুন। সলিল রায়ের নাম্বার বের করে বোতাম টিপলেন। রিং হচ্ছে।

'হ্যালো! মিস্টার রায়? সরি, এত রাত্রে ফোন করার জন্যে। আমার নাম অর্জুন দত্ত! আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে কিছু কথা বলতে পারি?'

সলিল রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আগে ফোন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'দেখুন, এই ব্যাপারে আমি কথা বলতে একদম রাজি নই।'

'কিন্তু আপনার স্ত্রী এদেশে এসেছেন, আপনি তাঁকে স্পনসর করেছেন—।'

'করেছিলাম। যখন সে আমার স্ত্রী ছিল। ফর ইওর ইনফরমেশন, ওই বিয়েটা আদালত আইনসম্মত ভাবে ভেঙে দিয়েছে। এই মহিলা আমার স্ত্রী হিসেবে এদেশে এসে অন্যায় করেছে।'

'আপনাদের ডিভোর্সের তারিখ কবে?'

'জানি না। শুধু জানি ওই অর্ডার বেরিয়ে গেছে।'

'প্লিজ সেটা জানার চেষ্টা করুন। কারণ ওই তারিখের পর আপনি স্পনসরশিপের কাগজপত্র পাঠিয়েছেন। নোটারি পাবলিককে দিয়ে সই করিয়েছেন ওই তারিখের পরে। যাকে ডিভোর্স করেছেন তাকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়ে কাগজ পাঠালেন কী করে? এটা আমেরিকান সরকার মেনে নেবে?'

ওপাশে কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর সলিল রায়ের গলা কানে এল, 'বেশ। ব্যাপারটা আমি চেক করছি।'

'সেটা করার পর যখন দেখবেন অভিযোগ সত্যি, তখন কী করবেন?'

'আমি জানি না। কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল। সেই লোভে এই ট্র্যাপে পড়ে গেছি। ওয়েল। আপনারা কী চান?'

'দেশে কী হয়েছে ভুলে যান। এখানে মিউচুয়াল ডিভোর্স ফাইল করুন। আপনাকে কোনও ক্ষতিপূরণ করতে হবে না।'

'ইমপসিবল।'

'কেন?'

'দেশে ডিভোর্সের অর্ডার বেরিয়ে গেছে জানার পরে গত সপ্তাহে আমি বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী এবাড়িতেই আছেন। যেহেতু তিনি বাংলা বোঝেন না, তাই আমি কথা বলতে পারছি। অন্য কিছু বলুন।' সলিল রায়ের গলা কাঁপছিল।

'পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখে আপনাকে জানাব। গুড নাইট।'

সেলফোন বন্ধ করে অর্জুন বললেন, 'উনি সব খবর রাখেন। তা ছাড়া উনি এখন বিবাহিত। ওঁর পক্ষে ডিভোর্সের মামলায় জড়ানো সম্ভব নয়।'

'তাহলে?'

'তবে ট্র্যাপে পড়ে গেছেন বলে উনি জানতে চেয়েছেন কী সাহায্য করতে পারেন।'

'আমার কোনও সাহায্যের দরকার নেই।'

বাড়ির বন্ধ কাচের জানলায় ঝোড়ো বাতাস জল ছুড়ছিল সশব্দে। অর্জুন স্বপ্নাকে বললেন, 'আপনি খেয়ে শুতে চলে যান।'

'আপনি?'

'আমি আরও একটু বসব।'

'আমার এখনই শুতে ইচ্ছে করছে না। দেশে আমি এগারোটার আগে শুতে যেতাম না।' হাসল স্বপ্না, 'আমি আর একটু পেতে পারি?'

'সহ্য করতে পারলে নিন।'

এবার আর ঢেলে দিলেন না অর্জুন। দেখলেন স্বাভাবিক পরিমাণই গ্লাসে ঢালল স্বপ্না, 'আমি ভাবতে পারছি না। আমার পরিচিত কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।'

'কী?'

'এই ভাবে বসে হুইস্কি খাচ্ছি। জীবন কী অদ্ভুত! আগে কাউকে মদ খেতে দেখিনি। যারা খায় বলে চিনতাম, তাদের মাতাল, লম্পট ভাবতাম। জানেন, আমি আপনাকেই প্রথম কাছে থেকে খেতে দেখলাম।'

'কলকাতার রাস্তায় এখনও মাতাল দেখতে পাওয়া যায়?'

'খুব কম।'

'সিনেমায়?'

'এখন বোধহয় কোনও চরিত্র তেমন মাতলামি করে না।'

'কিন্তু খোঁজ নিলে দেখবেন, বিশ বছর আগে কলকাতায় যত মদ বিক্রি হত এখন তার একশো গুণ বেশি বিক্রি হয়। মানুষ বুঝে গেছে কোথায় তাকে থামতে হবে।'

হঠাৎ একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল স্বপ্না, 'আমাকে আপনার কেমন লাগে?'

'ভাল। বাঙালি মেয়েরা এদেশে কারও না কারও ওপর নির্ভর করে থাকেন। খুব কম জনই একা লড়েন। অহনা তাদের একজন।'

'আমি অহনার বাড়িতে গিয়ে সিগারেট খাইনি।'

'কেন? ব্যালকনিটা তো ছিল।'

'না; আমার মনে হয়েছে সেটা ও পছন্দ করবে না। ওর মধ্যে এখনও দেশের ভ্যালুজ কাজ করে। মেয়েকে নিয়েই আছে। একবারও বলল না কেন ওদের ডিভোর্স হয়েছে।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত কথা বলবেই বা কেন?'

'ও কিন্তু আপনাকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে দ্যাখে।'

'এই তথ্য কোথায় পেলেন?'

'আপনার সঙ্গে একটা দুর্ঘটনাসূত্রে আলাপ। অথচ আজ আপনাকে দেখেই ওর মুখটা কী সুন্দর হয়ে উঠেছিল!'

'ধন্যবাদ। আমি দেখিনি। স্বপ্না, আপনার কথা একটু জড়িয়ে গেছে, মনে হয় এবার আপনার খেয়ে শুয়ে পড়া উচিত।'

'আমি তো কাল চলেই যাব। এভাবে গল্প করার সুযোগ হয়তো আর কখনও আসবে না। থাকি না আর কিছুক্ষণ!' স্বপ্না আবদার করল।

'বেশ। উঠুন।'

'উঠব?'

'হ্যাঁ।'

স্বপ্না গ্লাস শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

'সোজা আপনার বেডরুমে চলে যান। গিয়ে দাঁতের ব্রাশ আর পেস্টের টিউব নিয়ে নীচে নেমে আসুন।' হাসলেন অর্জুন।

'আ-আশ্চর্য! এখন আমি ব্রাশ করব!'

'না। আপনি ঠিকঠাক আসতে পারছেন কিনা দেখতে চাই।'

হলঘর পেরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখতে রাখতে স্বপ্না টের পাচ্ছিল তার শরীর কীরকম আলগা হয়ে গেছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। কোনওমতে দোতলায় নিজের ঘরে ঢুকে চারপাশে তাকাল। প্রথমে মনে হল সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ব্রাশটা যেন কোথায় রেখেছিল। তার পরে স্যুটকেসের ওপর পাহাড় হয়ে থাকা জামাকাপড় দেখতে পেয়ে সেগুলো চেপে ঢোকাতে চাইল। কিন্তু ব্যালান্স না রাখতে পেরে ধপ করে বসে পড়ল সে। তখনই মাথায় এল, তাকে নীচে যেতে হবে। খাট ধরে সোজা হয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখতেই শরীর টলে গেল। নীচে নামতে নামতে মনে হল, আর পারবে না। নির্ঘাৎ পড়ে যাবে সে। কোনওমতে সিঁড়িতে বসে রেলিং-এ মাথা রাখতেই মনে হল সে ঢেউ-এ দুলছে। চোখ বন্ধ করতেই হুঁশ চলে গেল।

দোতলায় ঘরের মেঝেতে বসে পড়ার শব্দ কানে এসেছিল অর্জুনের। তারপর মিনিট দশেক কেটে যাওয়ার পরেও যখন স্বপ্না ফিরে এল না তখন নিশ্চিত হলেন এই ভেবে যে, নিজের ঘরে পৌঁছে শুয়ে পড়েছে সে। ওর যে ভাল নেশা হয়েছে, তা টের পেয়েছিলেন তিনি। ভাগ্যিস ও ওপরে যেতে পারল, নইলে তাঁকে ওর শরীরটা বইতে হত। একটা রাত না খেলে কোনও মানুষ মরে যায় না।

এই মেয়েটাকে তিনি কী বলতে পারেন? অ্যাডভেঞ্চারিস্ট। সিগারেট খায়। শুধু আমেরিকায় এসে কাজ করার নেশায় এত বড় ঝুঁকি যে নেয়, তাকে স্বাভাবিক বলা কি ঠিক! কিন্তু ওর আচরণে বেয়াদপি নেই। মেয়েটাকে কাল সকালে অহনার বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। হঠাৎ অর্জুনের খেয়াল হল, এই ব্যাপারে অহনার সঙ্গে সরাসরি কথা হয়নি।

টেলিফোন করলেন অর্জুন। রিং হচ্ছে। কিন্তু কেউ ফোন ধরছে না। যদিও রাত হয়েছে, তবু এখনই কি অহনা ঘুমিয়ে পড়েছেন? লাইন কেটে গেল। রিডায়াল করলেন অর্জুন। আবার রিং হচ্ছে। তারপর একটি অল্পবয়সি মেয়ের গলা শুনতে পেলেন, 'কে ফোন করছেন?'

'তুমি তৃণা?'

'হ্যাঁ।'

'আমি অর্জুন দত্ত। তোমাদের বাড়িতে আজ গিয়েছিলাম। সেদিন একসঙ্গে লাঞ্চ করেছিলাম।' অর্জুন হাসলেন।

'ও। আই অ্যাম সরি। মা এখন বাড়িতে নেই। গুড নাইট।' বেশ ঝটপট ফোন রেখে দিল তৃণা। বেশ অবাক হয়ে গেলেন অর্জুন। মেয়েটা এভাবে কথা বলল কেন? অহনা কি ওকে বাড়িতে রেখে কোনও পার্টিতে গিয়েছে বলে রেগে গিয়েছে মেয়েটা? অহনাকে তো সেইরকম মা বলে মনে হয়নি। আর একবার ফোন করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত করলেন না অর্জুন। কাল সকালে কথা বলা যাবে।

ঘড়ি দেখলেন অর্জুন। যথেষ্ট রাত হয়ে গেছে। এবার খেয়ে শুয়ে পড়া যাক। বোতল তুলে রেখে গ্লাসদুটো তুলে কিচেনের দিকে যেতে গিয়ে নজর গেল সিঁড়ির দিকে। সর্বনাশ! মেয়েটা সিঁড়ির ওপর বসে ঘুমোচ্ছে। গ্লাস ধুয়ে রেখে দিয়ে অর্জুন স্বপ্নার সামনে এলেন, 'এই যে, এটা ঘুমাবার জায়গা নয়। উঠুন।'

কোনও সাড়া এল না। তিন-চারবার ডাকার পর একটা কাপে জল এনে স্বপ্নার মুখে ছিটে দিলেন অর্জুন। এবার বিরক্তি ফুটে উঠল চোখে, ঠোঁটে। কিন্তু তারপর আবার যে কে সেই। বাঁ হাতে মাথাটা ধরে একটু ঝাঁকালেন অর্জুন, 'খেতে পারবেন?'

'উঁ?'

'খাবেন?'

'সি-গা-রে-ট!' ঠোঁট দুটো ঈষৎ খুলে গেলে টেনে টেনে শব্দ বের হয়।

বিরক্ত হয়ে কিচেনে ফিরে গিয়ে খাবার নিয়ে বসলেন অর্জুন। খালি পেটে হুইস্কিপানে নেশা হতেই পারে। তিনি যদি প্রথমে আপত্তি করতেন, তাহলে স্বপ্না স্বাভাবিক থাকতেন। কিন্তু তাঁকে বেশি পীড়া দিচ্ছে তৃণার গলার স্বর। তাঁকে চিনতে পেরেও যেভাবে গুডনাইট বলে রিসিভার রেখে দিল, সেটাকে স্বাভাবিক বলতে তিনি রাজি নন। মায়ের ওপর যদি রেগে গিয়েও থাকে তাহলেও এভাবে কথা বলার শিক্ষা ওকে অহনা দিতে পারে না বলেই তাঁর ধারণা। এই ক'দিনের আলাপেও তাঁর খুব ভুল হওয়ার কথা নয়।

খাওয়া শেষ করে আলো নেভানোর আগে আর একবার ডাকলেন তিনি স্বপ্নাকে। তাতে স্বপ্না যেন সিঁড়ির মধ্যে আরও একটু আরাম করে শুতে চেষ্টা করল।

ওকে ডিঙিয়ে ওপরে উঠে এলেন অর্জুন। আলোটা নেভালেন না।

অন্ধকারে পড়ে গিয়ে স্বপ্না যদি হাত পা ভাঙে তাহলে কাল সকালে ওর যাওয়া হবে না।

স্বপ্নার ঘরের আলো জ্বলছে। দরজাটা ঠেলে দেখলেন, বিছানার ওপর স্যুটকেস, জিনিসপত্র চারপাশে ছড়ানো। আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে এলেন। বেশ শীত শীত করছে। দাঁত ব্রাশ করে আয়নায় নিজেকে দেখলেন। চল্লিশে পা দিলেও তাঁকে ঠিক প্রৌঢ় দেখায় না।

বড় লেপটা টেনে আলো নিভিয়ে শোওয়ার পর আবার তৃণার গলাটা তাঁকে অস্বস্তি দিল। ব্যাপারটা না জানা পর্যন্ত এটা যাবে না। প্রায় মরিয়া হয়ে বিছানায় শোওয়া অবস্থায় সেলফোনের বোতাম টিপলেন অর্জুন।

ফোন বাজছে। চারবারের পর কেউ ফোন তুলল, 'হ্যালো!'

পুরুষকণ্ঠ। ওই বাড়িতে কোনও পুরুষ থাকে কিনা তাঁর জানা নেই। অর্জুন গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি একটু অহনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'অহনা বাড়িতে নেই। কে আপনি?'

'তৃণা আছে?'

'ও আপসেট। শুয়ে পড়েছে। কে আপনি?'

'আমি অর্জুন দত্ত। অহনার সঙ্গে কথা বলে একটা বিষয় কনফার্ম করতে চাই।'

'শুনুন। অহনা এখন হাসপাতালে। আপনি একটু আগে ফোন করেছিলেন। তখনই তো তৃণা বলে দিয়েছিল অহনা বাড়িতে নেই। বার বার ফোন না করলে খুশি হব।'

'আপনার পরিচয় জানতে পারি?'

'আমি তৃণার বাবা। গুডনাইট।' ফোন রেখে দিলেন ভদ্রলোক।

অহনা হাসপাতালে! অদ্ভুত। সন্ধ্যাবেলায় যে-মহিলাকে একদম স্বাভাবিক দেখে এলেন, তাঁর হঠাৎ কী হল! কাল সকালে ব্যাপারটা জানতে হবে।

এমন হতে পারে, অ্যাকসিডেন্টের সময় মাথায় যে-আঘাত লেগেছিল, সেটাই হঠাৎ যন্ত্রণা ফিরিয়ে দিয়েছে। অহনা বাধ্য হয়েছেন হাসপাতালে যেতে। তৃণা একা থাকবে বলে ওর বাবা ওবাড়িতে এসেছেন। আর মায়ের কথা ভেবে তৃণা এত আপসেট হয়ে পড়েছে যে, স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারেনি।

এইরকম ভাবার পরে অর্জুন একটু স্বস্তি পেলেন।

একটু বাদেই ঘুম এল। এরকম বৃষ্টির রাত্রে লেপ মুড়ি দিলে গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে দেরি হয় না অর্জুনের। আজও হল না।

মাঝরাত্রে একটা কাঁপুনি শরীরে ছড়িয়ে পড়ায় চেতনা ঝাপসা হল স্বপ্নার। সে যে বিছানায় শুয়ে নেই তা বুঝতে সময় লাগল। কিন্তু কোথায় বসে আছে তা দেখার জন্যে খানিকটা সময় নিল। তারপর উঠে কোনওমতে দোতলায় চলে এল। এখনও অ্যালকোহল তার অর্ধেক চৈতন্যকে দখল করে রেখেছে। বিছানায় শুয়ে গায়ে কিছু চাপা দিয়ে ঘুমানো ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু চাওয়ার ছিল না স্বপ্নার।

দরজা ঠেলে অন্ধকার ঘরে ঢুকে আন্দাজে বিছানায় চলে এল সে। তারপর লেপ টেনে নিয়ে ভেতরে শরীরটাকে ঢোকাতেই চেতনা উধাও।

অস্বস্তিতে ঘুম চটকে গেল অর্জুনের। পাশ ফিরে ঘুমচ্ছিলেন তিনি। বাঁ হাত বাড়াতেই একটা নরম অনুভূতি এক ঝটকায় জাগিয়ে দিল তাঁকে। কেউ একজন পাশে শুয়ে আছে এবং তাঁর হাত সেই শরীরের বুকের ওপর পড়েছিল। বেড সুইচের আলো জ্বালতেই স্বপ্না চোখ কুঁচকে যেন আলো এড়াতেই অর্জুনের দিকে পাশ ফিরে হাত বাড়াল। অর্জুনের কোমরের কাছে হাত নেতিয়ে পড়ল।

মিনিটখানেক স্থির হয়ে রইলেন অর্জুন। বুঝতেই পারলেন, স্বপ্না ঘর গুলিয়ে ফেলেছে। ওর নেশা এখনও যায়নি। স্বপ্নার মুখের দিকে তাকালেন। ঘুমালে প্রত্যেকটি মানুষের মুখে ঈশ্বরের আশীর্বাদ জড়িয়ে যায়। যাদের যায় না তাদের জন্যে এই পৃথিবীতেই নরক অপেক্ষা করে। ধীরে ধীরে কীরকম মায়া মনে জাগল। এই মেয়েটা দুঃসাহস দেখাতে চেয়েছিল। নিজের জীবন বিপন্ন করেছিল আমেরিকায় আসার জন্যে। একমাত্র দু'লক্ষ টাকা ছাড়া এখন পর্যন্ত তার জন্যে বড় কিছু দাম যে ওকে দিতে হয়নি, এটা ওর সৌভাগ্য। কিন্তু আমেরিকান সরকার জানতে পারলেই ওকে এদেশ থেকে বের করে দেবে। মেয়েটা যে অসৎ নয়, তা পরিষ্কার।

আলো নিভিয়ে দিলেন অর্জুন। মাত্র এক ফুট দূরে স্বপ্না। স্বপ্না একটি সুন্দরী মহিলা। ঈশ্বর ওকে অহঙ্কার করার মতো শরীর দিয়েছেন। অর্জুনের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল স্বপ্নাকে জড়িয়ে ধরতে। এই মুহূর্তে সেটা করলে নিশ্চয়ই কোনও বাধা দিতে পারবে না মেয়েটা। কিন্তু তাঁর বুকের ওপর নেতিয়ে পড়ে থাকা হাতটায় বিন্দুমাত্র শঙ্কা নেই। উলটোদিকে পাশ ফিরলেন

অর্জুন। কিন্তু তাঁর আর ঘুম আসছিল না।

শেষপর্যন্ত ঠিক করলেন এই ঘরে না থেকে স্বপ্না যে-ঘরে ছিল, সেই ঘরে গিয়ে শোবেন। উঠে বসতে যেতেই হাতের ওপর চাপ দিয়ে ফেললেন অজান্তে। উঃ! শব্দটা বেরিয়ে এল স্বপ্নার মুখ থেকে। সৌজন্যবশত অর্জুন বললেন, সরি। তাতে কাল হল। হাতটা তাকে যেন পাশবালিশ ভেবে জড়িয়ে ধরল।

অর্জুন ডাকলেন, 'স্বপ্না। প্লিজ!'

স্বপ্না বলল, 'উঁ।'

'তুমি কোথায় শুয়ে আছ, জান?'

'উঁ।'

আর পারলেন না অর্জুন। মুখ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বপ্নার ঠোঁটে চুমু খেলেন। চোখ কুঁচকে গেল স্বপ্নার। ধীরে ধীরে সরে গেলেন অর্জুন। হঠাৎ তাঁর মনে ভয় এল। স্বপ্না বোধহয় টের পায়নি। কিন্তু ওর মুখের অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট, ব্যাপারটা একটুও ভাল লাগেনি। যদি ওর চেতনা ফিরে আসে এবং তাঁকে মেনে না নেয়, তাহলে মুখ দেখাবেন কী করে! খাট থেকে নেমে যে পাশের ঘরে চলে যাবেন, সে-সাহসও তাঁর হচ্ছিল না। যদি শব্দ হয় এবং সেই শব্দে স্বপ্নার ঘুম ভেঙে যায়।

মড়ার মতো উলটোমুখী হয়ে পড়ে রইলেন অর্জুন। ক্রমশ একটা খারাপ লাগা তাঁকে ঘিরে ধরছিল। যাকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন, তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিলেন তিনি? কেন এত দুর্বল হয়ে পড়লেন? জীবনের প্রথম চুম্বন এমন তস্করের মতো করে কী লাভ হল?

ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। ভাঙল দরজার শব্দ কানে যেতে। পাশ ফিরে দেখলেন স্বপ্না বিছানায় নেই। এখন সাতটা বারো। সঙ্গে সঙ্গে কাল রাতের ঘটনাটার কথা মনে আসতেই আড়ষ্ট হলেন অর্জুন। এখনও বুঝতে পারছেন না স্বপ্না নিদ্রিত ছিল কিনা!

'আই অ্যাম সরি। সত্যি বলছি।'

গলা শুনে দরজায় স্বপ্নাকে দেখে উঠে বসলেন অর্জুন।

স্বপ্না বলল, 'আমি বোধহয় ঘর গুলিয়ে ফেলেছিলাম।' তারপর একটু থেমে বলল, 'আপনি কেন জোর করে ওই ঘরে পাঠিয়ে দিলেন না?'

'জোর করলে কি সেটা শোনার মতো অবস্থায় ছিলে?

'ইস। কী যে খারাপ লাগছে। ওইটুকু খেয়ে যে এমন কাণ্ড হবে তা বুঝতেই পারিনি। আমি কি সিঁড়ির ওপর বসেছিলাম?'

'আজ্ঞে।' নেমে এলেন অর্জুন।

'তারপর?'

'তারপর আর কী? একটি ঘুমন্ত মানুষ ওপরে উঠে চলে এল এই ঘরে। আমার লেপ টেনে পাশে শুয়ে পড়ে দিব্যি ঘুমিয়ে নিল।'

'এম্মা! আমি আর কখনও ওই জিনিস খাব না!'

'চমৎকার। একটা লাইটার জ্বালাতে গিয়ে যারা আঙুল পোড়ায় তাদের মতো কথা বলছ! কিন্তু এই যে তুমি আমার পাশে নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমালে, আমি তো তোমার ক্ষতি করতে পারতাম!' অর্জুন তাকালেন। অসাড়ে তুমি বলে ফেললেন তিন।

'ক্ষতি?' বড়চোখে তাকাল স্বপ্না।

'তোমার শরীর নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করলে তুমি বাধা দিতে পারতে না।'

'আমি জানি আপনি কিছুতেই সেটা করবেন না!'

'জান? বেশ, যদি বলি করেছি, তুমি টের পাওনি।'

'যাঃ।' মুখে রক্ত জমল স্বপ্নার।

অর্জুন আর কথা না বাড়িয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। অশ্বত্থামা হত ইতি গজ হলেও কথাটা বলে দিয়ে এখন যেন নিজেকে একটু হালকা লাগল।

স্নান শেষ করে তৈরি হয়ে নীচে নেমে দেখলেন স্বপ্নাও তৈরি। চা আর বিস্কুট টেবিলে রেখে বলল, 'আপনার ফ্রিজে আর কিছু নেই।'

'হ্যাঁ। বাজারে যেতে হবে। আপনি তৈরি?'

'স্যুটকেসটা এখনও বন্ধ করা হয়নি।'

চা খেতে খেতে সেলফোনের বোতাম টিপতে লাগলেন অর্জুন। অহনা তার বাড়ির কাছাকাছি যে-হাসপাতালে আগের বার চিকিৎসার জন্যে গিয়ে থেকেছিল, তার নাম্বার তখন স্টোর করে রেখেছিলেন। সেটা পেয়ে যোগাযোগ করলেন। দু'বার রিং হতেই অপারেটারের গলা পাওয়া গেল। অর্জুন লাইনটা এনকোয়ারিতে দিতে বললেন। চা খেতে খেতে স্বপ্না দেখল অর্জুনের মুখ গম্ভীর। লোকটা মিথ্যে বলেছে তাকে। সারা রাত পাশে শুলেও,

তাকে একটুও অসম্মানিত করেনি লোকটা। যতই ঘুমে ডুবে থাক, তার পোশাক যেমন ছিল তেমনই থেকে গিয়েছিল। অবশ্য যদি জড়িয়ে ধরে থাকেন তাহলে আলাদা কথা। ভাবতেই লজ্জা ঝাঁপিয়ে এল।

'হ্যালো। আমি অর্জুন দত্ত বলছি। কাল রাত্রে অহনা আমিন নামে এক ভদ্রমহিলা আপনাদের ওখানে ভরতি হয়েছেন। এখন কেমন আছেন?'

'আপনি ওর কে হন?'

'আমি ওর পরিচিত। খবর পেলাম উনি আপনাদের ওখানে।'

'এখনও সেন্স আসেনি।'

'কী হয়েছে? মাথায় চোট পেয়েছিলেন ক'দিন আগে—।'

'আপনি জানেন না?'

'না।'

'কেসটা এখন পুলিশ তদন্ত করছে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।' ফোন রেখে দিল মেয়েটি।

হাঁ হয়ে গেলেন অর্জুন। স্বপ্না উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'অহনার কী হয়েছে? ও কোথায় ভরতি হয়েছে?'

'হাসপাতালে।'

'সে কী? কেন?'

গত রাত্রে প্রথমে তৃণা, পরে তৃণার বাবার সঙ্গে হওয়া কথাগুলো স্বপ্নাকে জানালেন অর্জুন। তারপর বললেন, 'আমি যখন বললাম মাথার চোটের কথা তখন মেয়েটা সেটাকে আমল না দিয়ে পুলিশ দেখিয়ে দিল। তার মানে কাল রাত্রে কি অহনা কোনও অ্যাকসিডেন্টে জড়িয়ে গিয়েছিল?'

'অ্যাকসিডেন্ট? ও কি আবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল?'

'চলুন। একবার হাসপাতালে যাব।'

'আমার জিনিসগুলো নিয়ে আসি—?'

স্বপ্নার মুখের দিকে তাকালেন অর্জুন, 'ওগুলো কোথায় রাখবেন? যে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সে-তো হাসপাতালে।'

'তাহলে?'

'চলুন।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন অর্জুন, দেখলেন প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা মিসেস স্কট খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসছেন, 'গুড মর্নিং

ডাটা। আমি তোমাদের দেরি করিয়ে দেব না।' তারপর স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইউ আর এ লাকি গার্ল। এতদিন ধরে ডাটাকে দেখছি, একশো ভাগ ভদ্রলোক। তোমার নাম কী? ওহো, আমি মিসেস স্কট।'

'স্বপ্না।' আড়ষ্ট গলায় বলল স্বপ্না।

'বাঃ। এখন থেকে তোমার সঙ্গে আশা করি প্রায়ই দেখা হবে। বাই।' বুড়ি চলে গেলে গাড়িতে উঠে অর্জুন বললেন, 'আমাদের দেশের গ্রামে পুকুরের ধারে যেসব বিধবা বৃদ্ধাদের দেখা যেত তাঁদের একজনকে এখানেও পেয়ে গেলেন।'

সকালের এই সময়টায় নিউজার্সি থেকে নিউইয়র্কে যাওয়াটা মোটেই সুখকর নয়। অর্ধেক দিন স্টেশনে গাড়ি রেখে ট্রেন ধরেন অর্জুন। কিন্তু আজ হাসপাতালে যাবেন এবং স্বপ্না সঙ্গে থাকায় গাড়ি নিয়েছিলেন। ব্রিজে ওঠার আগে বিশাল জ্যাম। যখন হাসপাতালের সামনে পৌঁছালেন তখন সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। গাড়ি পার্ক করে হাসপাতালের গেটে পা দিতেই স্বপ্না রবার্টকে দেখতে পেল। বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। স্বপ্না অর্জুনকে বলল, 'একটু দাঁড়ান। ওই লোকটি অহনার খুব উপকার করে। ওঁর সঙ্গে কথা বললে বোঝা যাবে।'

রবার্ট দেখতে পেয়েছিল ওদের। স্বপ্না কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'অহনার কী হয়েছে? ও হাসপাতালে কেন?'

'পুলিশ আমাকে এই প্রশ্ন করেছিল। আমি তাদের বলেছি কিছু জানি না। কী করে জানব? আমি ঘুমোচ্ছিলাম। আমার স্ত্রী ঘুম ভাঙিয়ে বলল ওদের বাড়িতে পুলিশ এসেছে। তার পরেই অ্যাম্বুলেন্স। তখন অনেক রাত। আমি জানব কী করে!'

'কারও কাছে কিছু শোনেননি?'

'শুনেছি। একটু আগে ওর সেন্স ফিরেছে। বাট স্টিল নট আউট অফ ডেঞ্জার।' রবার্ট বলল, 'এত ভাল মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। ঈশ্বরের কাজ হল বেছে বেছে ভালদের ক্ষতি করা। পুওর গার্ল!'

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'অহনার কী হয়েছিল?'

'ওকে ছুরি মেরেছে। বুকে, পেটে। আমার মনে হয় তোমরা জনসনের সঙ্গে কথা বললে ঠিকঠাক জানতে পারবে। ও ভেতরে আছে।'

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, 'তৃণা কি ভেতরে?'

'না। ও বাড়িতে।' রবার্ট কাঁধ নাচাল, 'ওর বাবার সঙ্গে।'

ভেতরে ঢুকলেন অর্জুন। এনকোয়ারিতে গিয়ে জানতে পারলেন অহনার অবস্থা ভাল নয়। ওর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকী পুলিশকেও নিষেধ করা হয়েছে বিরক্ত করতে।

এই অবস্থায় যখন কিছুই করার নেই তখন আর হাসপাতালে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে বলে বেরিয়ে যেতে পারতেন অর্জুন। কিন্তু মধ্যরাত্রে কেউ অহনাকে ছুরি মেরে ক্ষতবিক্ষত করেছে শোনার পর কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল। কে সেই আততায়ী? পাশে দাঁড়িয়েছিল স্বপ্না। বলল, 'নীচে দুই প্রৌঢ়া মহিলা আর জনসন নামে একটি কালো লোক ভাড়ায় থাকে। জনসন সম্পর্কে অহনার ধারণা ছিল খুব ভাল। আর তিনতলায় একজন পুলিশ অফিসার আর তার বউ গতকালই ভাড়া নিয়ে এসেছেন। মূল দরজা সবসময় বন্ধ থাকে। তাহলে বাড়ির ভেতরের কেউ ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। ওই গাঁজা খাওয়া বউটা নয় তো?'

'কে সে?'

'পুলিশ অফিসারের বউ। কাল ও বাড়িতে এসে আমার কাছ থেকে কুড়ি ডলার ধার নিয়ে গাঁজা খেয়ে এসেছিল। বড়সড় চেহারা। হয়তো ওকে ওই নিয়ে কিছু বলেছিল, তাই—!' স্বপ্না থেমে গেল।

'জনসনকে আপনি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। অহনার সঙ্গে বাড়িতে ঢোকার সময়, এক ঝলক। কিন্তু এখন দেখলে চিনতে পারব কিনা জানি না।'

এই ঘরে ভিজিটার্সদের ভিড়। অর্জুন তাকালেন। রবার্টের কথা অনুযায়ী জনসন এখানেই আছে। কালো মহিলা কয়েকজন আছেন কিন্তু কোনও কালো পুরুষ চোখে পড়ল না।

এই সময় রবার্ট এগিয়ে এল, 'আই অ্যাম সরি। জনসনকে পুলিশ স্টেশনে যেতে হয়েছে। ওকে পুলিশ ডেকে পাঠিয়েছে। এই মাত্র ফোনে জনসন আমাকে জানিয়েছে। আমি সেখানে যাচ্ছি। তোমরা কি যেতে চাও?'

অর্জুন স্বপ্নাকে বললেন, 'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি দেখে আসছি।'

'আমিও যাব।'

'না। আপনি ট্যুরিস্ট ভিসায় আছেন। খামোকা পুলিশের সামনে গিয়ে কী লাভ? ওরা তো আপনার পরিচয় জানতে চাইতে পারে!'

স্বপ্না দমে গেল। মুখে ছায়া নামল।

অর্জুন হাসলেন, 'ভয় পাওয়ার মতো কিছু হয়নি। ওই চেয়ারে আরাম করে বসে চারপাশ দেখুন। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব।'

যেহেতু কথাগুলো বাংলায় হল তাই রবার্ট বুঝতে পারল না। অর্জুন তাকে বললেন, 'লেটস গো। আমি অর্জুন।'

'আমি ওই সুন্দরী মহিলাকে কালই প্রথম দেখেছি। তুমি ওর কেউ?'

'বন্ধু ভেবে নাও।' হাঁটতে হাঁটতে বললেন অর্জুন।

'তুমি অহনাকে চেনো?'

'হ্যাঁ। কয়েকবার কথা হয়েছে।'

'কী বলল? বেঁচে যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই। আমরা সবাই চাই ও ভাল হয়ে ফিরুক।'

'ফেরার পরে আরও বড় সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে মেয়েটাকে। ও হ্যাঁ, আমার গাড়িটাকে তুমি ফলো কর।' রবার্ট আচমকা কথা শেষ করল।

রবার্টের গাড়িকে অনুসরণ করতে করতে অর্জুনের মনে হল ওই লোকটা সব জানে, কিন্তু মুখ খুলছে না।

দূর থেকে জনসনকে দেখিয়ে দিল রবার্ট। বিশাল লম্বা, মোটাসোটা এক কালো প্রৌঢ়। একজন পুলিশ অফিসার ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে নোট নিচ্ছেন। কাছে গিয়ে রবার্ট নিজের পরিচয় দিল, 'আমি রবার্ট। অহনার প্রতিবেশী। ওকে অনেকদিন থেকে চিনি। আমার মেয়ের মতো ও।'

'আপনি ওখানে অপেক্ষা করুন। আমি এর সঙ্গে কথা বলছি।'

'ওকে!' বলে রবার্ট দূরের একটা চেয়ারে গিয়ে বসল।

অফিসার অর্জুনের দিকে তাকালেন, 'ইয়েস?'

অর্জুন নিজের নেমকার্ড এগিয়ে দিল অফিসার সেটা দেখলেন।

'বলুন!'

'অহনাকে আমি কাল সন্ধেবেলায় দেখেছিলাম। মাঝরাত্রে খবর পাই ওকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।'

'জাস্ট এ মিনিট। আপনি নিউজার্সিতে থাকেন। কে খবর দিয়েছিল?'

'আমার একটা জিনিস জানার দরকার হওয়ায় আমি এগারোটা নাগাদ ফোন করি। প্রথমে কেউ ফোন ধরেনি। দ্বিতীয়বারে ওর মেয়ে রিসিভার তুলে জানায় যে অহনা বাইরে গেছে। আমাকে কথা বলতে না দিয়ে ফোন কেটে দেয় সে। তার কিছুক্ষণ পরে আবার যখন ফোন করি তখন এক ভদ্রলোক সাড়া দিয়ে বলেন, তিনি মেয়েটির বাবা আর অহনাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তিনিও বেশ বিরক্ত হয়ে কথা বলেছেন। আমি হাসপাতালে গিয়ে শুনলাম, কেউ ওকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে। ওর মতো মেয়েকে সেটা কেউ কেন করবে? যে করেছে সে কি বাড়ির কেউ? আমরা খুব আপসেট হয়ে পড়েছি অফিসার।'

'বসুন।' অফিসার সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললেন।

অর্জুন বসলেন।

'আপনার সঙ্গে মিসেস অহনার পরিচয় কতদিনের?' অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

'মাত্র কয়েকদিন।'

'ওঁর বাড়িতে আপনি কাল গিয়েছিলেন। কেন?'

'উনি যেতে বলেছিলেন। চা খাওয়ার জন্যে।'

'এঁকে দেখেছেন?'

'না।'

'জনসন, আপনি ওকে দেখেছেন?'

জনসন মাথা নেড়ে নিঃশব্দে না বলল।

'আপনি যখন ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন তখন আপনাকে কে কে দেখেছিল?'

মনে করার চেষ্টা করলেন অর্জুন। তৃণার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। একেবারে বেরোবার সময় অহনার নতুন ভাড়াটেকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেছিলেন। তার কথা জানালেন অর্জুন।

'ওর মেয়ে কি বাড়িতে ছিল না?'

'আমি জানি না। সে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেনি।'

'মিস্টার ডাট। আপনার কার্ড আমি রাখলাম। যদি প্রয়োজন হয় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

অফিসার তাকালেন।

'অপরাধী কি ধরা পড়েছে?'

'এখনও পড়েনি। কিন্তু পড়বে।'

'অহনা কি বাড়ির ভেতরেই—।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু বাড়িতে ঢুকল কী করে?'

'ঢুকেছিল। কিন্তু পালিয়েছে ব্যালকনি থেকে লাফিয়ে পড়ে। পড়ার সময় নিজের অজান্তে কিছু ফেলে গেছে যা দিয়ে ওকে আইডেন্টিফাই করা সহজ হয়ে যাবে। ওকে!'

বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়ির ভেতর মিনিট দশেক বসে থাকলেন অর্জুন। একটা লোক মধ্যরাতে কারও সাহায্য ছাড়া বাড়িতে ঢুকতে পারে না। ঢুকে অহনাকে ছুরিতে আহত করে কেন চলে যাবে?

এইসময় জনসনকে দেখতে পেলেন অর্জুন। পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটছে। গাড়ি থেকে নেমে অর্জুন ডাকলেন, 'হাই জনসন!'

জনসন দাঁড়াল। তাকাল। মাথা নাড়ল।

'আমি অহনার ওয়েল উইশার। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

'আমি এখন হাসপাতালে যাব।'

'বেশ তো। যেতে যেতে কথা বলি। প্লিজ উঠে এসো।'

গাড়িতে উঠে জনসন বিড়বিড় করল কিছু। বুঝতে পারলেন না অর্জুন।

লোকটার চেহারা দেখলে যে-কোনও বাঙালি শিশু ওকে দৈত্য ভাববে। নিউইয়র্কের রাস্তায় এই চেহারার হাজার হাজার কালো দেখা যায়। তাদের কারও কারও ব্যবহার বেশ খারাপ।

'অহনার ব্যাপারটা তুমি কখন জানতে পারলে জনসন?'

'নো মোর কোয়েশ্চেন। পুলিশ আমার মুখ ব্যথা করিয়ে দিয়েছে।'

'আই অ্যাম সরি। কিন্তু আমি কিছুই জানি না। অহনা আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে। ওর এরকম কী করে হল ভাবতে পারছি না।'

'শি ইজ এ গুড গার্ল। ওর কোনও সমস্যা হলেই আমাকে ফোন করত। আমার ল্যান্ডলেডি বলে দূরত্ব রাখত না। শুধু কাল রাত্রে যদি ও আমাকে ফোন করত!' শব্দ করে শ্বাস ফেলল জনসন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালালেন অর্জুন। হঠাৎ সোজা হয়ে বসার চেষ্টা

করল জনসন, 'তৃণার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঘড়িতে তখন রাত পৌনে এগারোটা। এমন কিছু রাত নয়। আমি ভোর চারটের সময় উঠি বলে সাড়ে ন'টায় শুয়ে পড়ি। চিৎকার শুনে বুঝলাম দোতলায় কোনও বিপদ হয়েছে। তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেলাম। অহনার ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখে অবাক হলাম। ওদের শোওয়ার ঘরে যাওয়ার প্যাসেজে তৃণা মেঝেতে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে এবং ওর পরনে কোনও পোশাক নেই। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে! সে আঙুল দিয়ে ওর শোওয়ার ঘর দেখিয়ে দিল। ঘরের দরজায় গিয়ে দেখলাম অহনা মেঝেতে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর রাতপোশাক। আমি দৌড়ে বসার ঘরে ফিরে পুলিশকে ফোন করলাম। হাসপাতালকে বললাম অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে। তারপর তৃণাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছিল? সে জবাব না দিয়ে দৌড়ে চলে গেল তার মায়ের ঘরে। আমি অহনাকে কথা বলাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওর তখন জ্ঞান ছিল না। পুলিশ এবং অ্যাম্বুলেন্স চলে এল তক্ষুনি। ওরা স্ট্রেচারে শুইয়ে অহনাকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। অফিসার আমার কাছে জানতে চাইলেন কী হয়েছে। উনি এমন ভাবে কথা বলছিলেন, যেন আমিই অহনাকে ছুরি মেরেছি। যা ঘটেছিল শোনার পরেও ওঁরা বিশ্বাস করছিলেন না। ওপরে যে নতুন ভাড়াটে এসেছে সেই মিস্টার জোন্স নেমে এসেছিলেন। তিনিও বললেন মেয়ের গলায় চিৎকার শুনেছেন। যেহেতু তিনি একজন পুলিশ অফিসার তাই পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করেনি। অনেক ডাকাডাকির পরে তৃণা ওর মায়ের পোশাক পরে বেরিয়ে এসেছিল। ও সোজাসুজি বলে দিল যে ওর বয়ফ্রেন্ড এসেছিল। ওরা পড়াশুনা নিয়ে কথা বলছিল। ওর মা সেটা পছন্দ করেনি এবং খারাপ কথা বলছিল। বয়ফ্রেন্ড মারতে গিয়েছিল। তৃণা নাকি ভয় পেয়ে টয়লেটে চলে গিয়েছিল। বেরিয়ে এসে দ্যাখে তার মা মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, বয়ফ্রেন্ড নেই। আতঙ্কে সে চিৎকার করে ওঠে এবং তখন নাকি আমি ওপরে উঠে আসি। পুলিশ অনুমান করে, বয়ফ্রেন্ড ব্যালকনি থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে চলে গেছে। তৃণা তার বাবাকে খবর দেয়। তিনি চলে আসেন। আমি তখন পুলিশের গাড়িতে হাসপাতালে যাই।' জনসন থামল।

'তৃণা ওর বয়ফ্রেন্ডের নাম বলেছে?'

'প্রথমে বলতে চায়নি। পরে বলেছে। সেল নাম্বারও পুলিশকে দিয়েছে। কিন্তু সেল বন্ধ করে রেখেছে সে।'

'কিন্তু অহনার অজান্তে ছেলেটা তৃণার ঘরে গেল কী করে? নীচ থেকে লাফিয়ে ব্যালকনিতে নিশ্চয়ই ওঠা যায় না।'

জনসন তাকাল, 'লুক ম্যান। এই মেয়েটা প্রচণ্ড মিথ্যে বলেছে। পুলিশকে ও বলেছে বয়ফ্রেন্ড নাকি ওর মাকে জানিয়ে এসেছিল। তাই যদি হয়, আসার পরে অহনা রেগে যাবে কেন? আমি যখন তৃণাকে মেঝের ওপর বসে কাঁদতে দেখি, তখন ও সম্পূর্ণ নগ্ন ছিল। নগ্ন হয়ে কেউ পড়াশুনা করে? আমার মনে হয় মাকে লুকিয়ে তৃণাই ছেলেটাকে মেন দরজা খুলে দিয়েছে। অহনা নিশ্চয়ই ওদের সেক্স করতে দ্যাখে। দেখে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে না। বোধহয় ছেলেটাকে মারে। ওই ছেলে নিশ্চয়ই ছুরি ক্যারি করত। যেভাবে ও অহনার শরীরে ছুরি চালিয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে ওর মনে কোনও দয়ামায়া নেই। ও মেরেই ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ছুরিতে আহত হওয়ার সময়ে অহনা চিৎকার করেনি। কেন?

'হয়তো সুযোগ পায়নি।' অর্জুন গম্ভীর।'

'হতে পারে। ছেলেটা ব্যালকনি দিয়ে পালিয়েছে বলে তৃণা জানিয়েছে। ও কী করে জানল। ওর কথা অনুযায়ী সে সময় তো ও টয়লেটে ছিল। আমার মনে হচ্ছে ছেলেটা চলে যাওয়ার পরে তৃণা চিৎকার করেছে। কিন্তু তখন ওর খেয়াল ছিল না যে, পরনে কোনও পোশাক নেই।'

'তুমি বলতে চাইছ, তৃণা ছেলেটাকে আড়াল করছে?'

'চেয়েছিল। কিন্তু ওর বয়স কম। ম্যাচিওরিটি আসেনি। পুলিশের জেরার কাছে বেশিক্ষণ মিথ্যে বলতে পারবে না।'

'কিন্তু পুলিশ তো ওকে অ্যারেস্ট করেনি!'

'ছেলেটাকে পাওয়ার পর পুলিশ যা করার তা করবে।' জনসন মাথা নাড়ল, 'অহনা গর্ব করে বলত, ওর দেশের মেয়েরা বিয়ের আগে সেক্স করে না। টিনএজাররা তো নয়ই। ও সবসময় মেয়েকে আগলে রাখার চেষ্টা করত। কিন্তু এই দেশে থেকে সেটা যে সম্ভব নয়, তা আর একবার প্রমাণিত হল।'

'কিন্তু জনসন, তুমি তো অহনার ভাড়াটেদের একজন। বাকিরা কি তোমার মতো হাসপাতালে যাওয়া-আসা করছে?'

'আমি দেখিনি।'

'তুমি কেন করছ?'

'আরে! করব না? অবশ্য কী বা করছি। কী ক্ষমতা আমার। অহনা আমাকে

কলেজের বাইরে ও ভিতরে। এই ভদ্র, বুদ্ধিমান ও বিবেকী মানুষটির মৃত্যু ঘটল কীভাবে এ নিয়ে তর্ক আছে। তিনি কি খুন হয়েছেন? অথবা আত্মহত্যা করেছেন? পারিপার্শ্বিক ঘটনা থেকে অনুমান হয়, দৃঢ়ভাবেই অনুমান করা সম্ভব, এটা এক হত্যাকাণ্ড। তবে এই অনুমান যদি সত্য প্রমাণিত না হয় তবু যে প্রশ্নটি থেকেই যায় তার গুরুত্বও কম নয়। রিজওয়ান আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন কেন? কোন চরম নৈরাশ্য তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল? প্রিয়াংকা স্পষ্ট বলেছিলেন তিনি স্বেচ্ছায় রিজওয়ানের কাছে এসেছেন, পিতার কাছে ফিরে যেতে তিনি ছিলেন অনিচ্ছুক। অবশেষে তিনি যেতে সম্মত হয়েছিলেন কোন যুক্তিতে? পিতার অসুস্থতার কথাটা একমাত্র যুক্তি ছিল না। তিনি অশোক তোদির বাড়িতে অন্তত কিছুদিনের জন্য না গেলে পুলিশ রিজওয়ানকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে এই আশঙ্কাটা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। রিজওয়ানকে ধরে নিয়ে যাবার কোনও আইনসংগত কারণ ছিল না। তবু এই বেআইনি কাজটা পুলিশ করবে এবং এই নির্দোষ যুবকটির ওপর অত্যাচার চলবে। এই চিন্তাই প্রিয়াংকাকে আতঙ্কগ্রস্ত করেছিল। রিজওয়ানকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টাতেই অনিচ্ছুক প্রিয়াংকা সাতদিনের জন্য পিতৃগৃহে যেতে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি আর ফিরে আসতে পারবেন কিনা এ বিষয়ে দু'জনের মনেই গভীর সংশয় ছিল। যদি প্রিয়াংকাকে পতিগৃহে ফিরে আসতে দেওয়া না হয় তবে দু'জনেই প্রয়োজনে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন, এই রকমের একটা অলিখিত সংকল্প মনে রেখেই এঁরা পরস্পরের কাছ থেকে সেদিন বিদায় নিয়েছিলেন, এই ধারণা কি কষ্টকল্পনা? রিজওয়ানুর রহমানের মতো একটি সুপ্রিয় যুবক যদি চরম নৈরাশ্যে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে থাকেন তবে এজন্য অশোক তোদি ও পুলিশকে দায়ী করা চলবে না এই সিদ্ধান্ত কি মান্যতা পেতে পারে? খুনই হোক অথবা আত্মহত্যা হোক, এজন্য কে দোষী সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

এ রাজ্যে পুলিশ ও প্রশাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা কিছু কাল যাবৎ নানা ঘটনার আঘাতে ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। প্রিয়াংকা ও রিজওয়ানের মিলন ও বিচ্ছেদকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস রচিত হল তার কলঙ্কের স্পর্শে পশ্চিমবঙ্গ এক চরম দুর্দশার অভিমুখে আরও এগিয়ে গেল ভয়াবহ দ্রুত গতিতে। আইনের শাসন ভেঙে পড়ছে, দুঃশাসনের রাজত্ব কতদিন চলবে বলা কঠিন। সুস্থ সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ বাঙালির মন থেকে মুছে গেছে একথা বলব না আজও। কিন্তু সেই সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার মতো সংকল্পে

দৃঢ় নাগরিক মঞ্চ কি আমরা দ্রুত গড়ে তুলতে পারব? সীমাহীন দুর্নীতি ও বিচারহীন অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠ সংগঠিত করবার দিন নিশ্চয়ই এসেছে। প্রতিবাদী ধ্বনি ক্রমে প্রবল হচ্ছে, শান্তিপ্রিয় যে মানুষেরা এতদিন প্রায় নীরব ছিলেন তাঁরাও দলনির্বিশেষে আজ সরব ও সক্রিয় হয়ে উঠছেন, এটাই আশার কথা। দলীয়তার স্পর্শে মহিলা কমিশন বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে একথা যেমন স্বীকার্য তেমনই এ কথাও তো অস্বীকার করা যায় না যে, দলীয় নিয়ন্ত্রণের সীমানার বাইরে স্বাধীন নারীকণ্ঠের বলিষ্ঠ উচ্চারণ আজ এক নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এমনই এক নারী গৃহবন্দি প্রিয়াংকার নাম উল্লেখ করে বলছিলেন, ওকে আবারও বোঝাতে হবে যে মা-বাবা সবারই প্রিয় কিন্তু সত্যের চেয়ে প্রিয় নয়। এই রাজ্যে দলীয় দুর্নীতি, ক্ষমতার লোভ ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে সত্যাশ্রয়ী নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলা আবশ্যক, দুঃশাসনের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে এই কথাটা নির্ভয়ে বলাটাই বিবেকবান নরনারীর আজ মহত্তম কর্তব্য।

কিছু মূল প্রশ্ন তুলে ধরে এই লেখা শেষ করছি।

কন্যা প্রিয়াংকার বিবাহের ব্যাপারে পিতা অশোক তোদির ঘোরতর বিরোধিতার কারণ কী? রিজওয়ানুর রহমান মধুর স্বভাবের যুবক, শিল্পবোধ সম্পন্ন শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের কাছে একজন প্রিয় মানুষ, ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পাশ করেছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট কলেজ থেকে। সংস্কৃতির বিচারে তাঁকে কিছুতেই অযোগ্য ভাবা যায় না। তবে অশোক তোদির আপত্তি কোথায়? দুটি কারণ ভাবা যায়। প্রথম কারণ, রিজওয়ান দরিদ্র শিক্ষক আর তোদি কোটিপতি। ধনের এই অসাম্যের কথা জেনেশুনেই যদি প্রিয়াংকা জীবনসঙ্গী রূপে ওই সুশিক্ষিত সংস্কৃতিবান যুবকটিকে নির্বাচন করে থাকেন তবে কন্যার রুচি ও নীতিবোধকে সাধুবাদ দিতেই আগ্রহী হবেন সেই সব মানুষেরা যাঁদের কাছে সামাজিক সাম্যের আদর্শের মূল্য আছে। আপত্তির দ্বিতীয় কারণ হতে পারে দুই পরিবারের ভিতর ধর্মের প্রভেদ। রিজওয়ান কিন্তু তাঁর প্রেমিকাকে ধর্মত্যাগ করতে বলেননি। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের এবং নিকট আত্মীয়দের আচরণে দেখা গেছে প্রশ্নাতীত ঔদার্য। সেই ঔদার্যকে সম্মান দেখাতে পারেননি প্রিয়াংকার পিতা।

তবু অশোক তোদির পিতৃহৃদয়কে সহানুভূতি জানাতেই রাজি হত আমাদের সমাজ যদি তিনি তাঁর বিরোধিতাকে একটা সীমার ভিতর রাখতেন।

যে পরিকল্পিত কৌশলের সঙ্গে তিনি নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে অগ্রসর হলেন তাতেই তিনি হারালেন সুশীল সমাজের সমস্ত সহানুভূতি। কন্যাকে বস্তুত তিনি গৃহবন্দি করে রেখেছেন। খবরে যতটা জানা যায়, এই ধনকুবেরের অগাধ অর্থ অর্জিত হয়েছে সন্দেহজনক উপায়ে। সেই বিপুল অর্থ ও তজ্জনিত প্রতিপত্তি তিনি নিযুক্ত করেছেন পুলিশকে অন্যায় পথে চালাবার কাজে। দুষ্ট এক প্রশাসন একাজে সহায়ক হয়েছে।

এরই ফলে গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছে অশোক তোদির বিরুদ্ধে। রিজওয়ানকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। প্রিয়াংকাকে তোদি পরিবারের কারাগার থেকে উদ্ধার করা সম্ভব কি না জানি না, তবে সেটাই হতে পারে এই মুহূর্তে গণ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি। বৃহত্তর অর্থে সাম্য স্বাধীনতা ও ধর্মীয় মিলনের স্বপক্ষে এই আন্দোলন। এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করবার মতো সংকল্পের দৃঢ়তা কি আছে আজকের বাঙালি সমাজের?